নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩২২
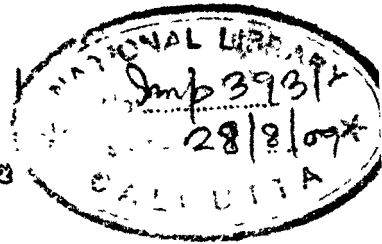
"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারায়ণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩॥০ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য সাধারণতঃ।/০ আনা এবং ডাক মাশুল /০ আনা। সচিত্র বিশেষ সংখ্যার মূল্য ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীমহেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
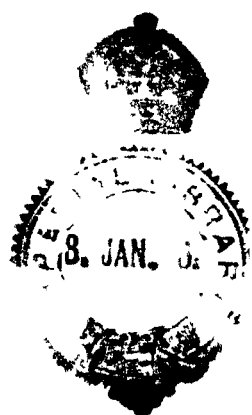
নারায়ণ

২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা]   [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

চরিত-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র

২।

বীজ ও বংশের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের ও প্রতিভার প্রকৃত মূল্য কষিতে হইলে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার, অন্য-দিকে সেইরূপ যে বংশধারাতে, যে বীজ হইতে, তাঁর জন্ম হইয়াছিল, তাহারও যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। মানুষ কেবল বাহি-রের অবস্থাতেই গড়িয়া উঠে না; এসকল অবস্থা ও ব্যবস্থা, তার ভিতরকার জীব-শক্তিকেই নানাভাবে ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদ্-জগতে যেমন বীজ সেইরূপই গাছ হয়। কাঁটালবীজে কাঁকুড় ফলে না। সর্ব্বত্রই এইরূপ—যেমন বীজ তেমনি জীব। কিন্তু উদ্ভিদ্-জগতেও কেবল বীজেতেই গাছ হয় না, তার জন্য মাটিও চাই। এই মাটির গুণাগুণ বীজেতে প্রবেশ করিয়া, একই বীজ হইতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে। শ্রীহট্টের কমলালেবু খাসিয়া পাহাড়ে জন্মায়, ঐ পাহাড়ীয়া মাটির গুণেই এই লেবু এমন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়। এই কমলালেবুর বীজ বাঙ্গালা দেশের সমতল জমিতে পুঁতিলে কমলালেবু আর ফলে না, গোঁড়া লেবু হইয়া যায়। বীজের শক্তি

মাটির গুণে নানা আকার ধারণ করে। কেবল তাই নহে, উদ্ভিদের বিকাশের জন্ম আকাশের বায়ু, রৌদ্র এবং বৃষ্টিরও প্রয়োজন। এই জমি, এই রৌদ্র, এই বৃষ্টি, এ সকলই উদ্ভিদের বিকাশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। উদ্ভিদের বিকাশে বীজটি তার হেরিডিটি (heredity); জমি, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার আধার ও আবেষ্টন, তার এন্‌ভাইরণমেন্ট্‌স্ (environments)। আধুনিক অভিব্যক্তিতত্ত্বে বা ইভোলিউষণে (evolution'এ) এই হেরিডিটি ও এন্‌ভাইরণমেন্ট দুইটিই মূলতত্ত্ব। হেরিডিটি জীবের বীজকোষের মধ্যে নিহিত থাকে। এই বীজকোষ হইতে এই বীজ-শক্তিকে আমরা পৃথক্ করিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে কোষ মাত্রেই আধার, আধেয় নহে। বীজকোষও বীজের আধার, আধার বলিয়াই তাহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। তাহাকেও এন্‌ভাইরণমেন্টই বলিতে হয়। কিন্তু এই আধারের সঙ্গে ঐ আধেয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানেতে আমরা ইহাদের পৃথক্ করিয়া দেখিতে, জানিতে, বা ভাবিতে পারি না। এই বীজকোষেতে যে বস্তুটি নিগূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, তাহাই জীবের জীবত্ব, তাহাই তার নিত্যত্ব; সেই বস্তুকে দেখি না, কিন্তু দেখি না বলিয়া, তাহা যে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ জীবের যে সকল পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করি, তার অন্তরালে একটা কিছু নিত্য বস্তু না থাকিলে, এই প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনেরও কোনই অর্থ হয় না।

> তিলেষু তৈলং, দধিনীব সর্পিঃ স্রোতস্বাপঃ
> অরণীষু অগ্নিঃ—

তিলেতে যেমন তৈল নিগূঢ়ভাবে থাকে, তার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, অথচ তাহাকে দেখা যায় না; দধিতে যেমন ঘৃত থাকে; শুষ্ক নির্ঝরিণী-গর্ভে যেমন জল থাকে; অরণীতে যেমন অগ্নি থাকে;—সেইরূপ প্রত্যেক বিকাশশীল জীবের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন

থাকে, যাহা তার একত্ব, তার জীবত্ব, তার নিজত্ব ও নিত্যত্বের ভূমি এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়াই তার বিকাশ-ধারার সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয়। এইটিই তার মূল বস্তু। এইটিই তার বীজ। এই বস্তুই তার হেরিডিটির মূল উপাদান। এই বস্তু তার পৈত্রিক ও পুরুষানুক্রমাগত। জীবের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এই বস্তুকেই তার নিজের শক্তিতে ও নিজের আকারে, নিজের বৈশিষ্টের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদের এই বস্তু তার স্বজাতীয়ত্ব; আমের ইহাই আম্রত্ব; ইহাই কাঁটালের কাঁটালত্ব; ইহাই গোলাপের গোলাপত্ব ও অপরাজিতার অপরাজিতাত্ব; ইহাই বটের বটত্ব ও অশোক-পলাশের অশোকত্ব ও পলাশত্ব। আমাদের এই বস্তু কেবল সাধারণ মনুষ্যত্ব নহে, কিন্তু ইহাই ইংরাজের ইংরাজত্ব, জার্ম্মাণের জার্ম্মাণত্ব এবং কাফ্রির কাফ্রিত্ব। আবার ইহাই জনের (John) জনত্ব, কার্লের (Karl) কার্লত্ব, রামের ও শ্যামের রামত্ব ও শ্যামত্ব, প্রত্যেকের কুলধারার বৈশিষ্ট ও প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই বঙ্কিমত্ব। এই প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় বস্তুতেই তাঁর জীবনের, চিন্তার ও চরিত্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্রের মধ্যে তাঁহার একত্ব ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে। এই বস্তুর দ্বারাই তিনি তাঁর দেশের, সমাজের, সময়ের, অপর সকল লোক হইতে পৃথক্ ও বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃপুরুষানুক্রমিত এই বীজটিই তাঁর বিকাশের মূল বস্তু, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে এই বস্তুকেই নানাদিকে ও নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈজিক বস্তুটি অতি শ্রেষ্ঠজাতীয় ছিল। অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর অতিশয় বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইংরেজ-সরকারে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কুল-গৌরব, পদ-গৌরব, ধন-গৌরব, বিদ্যাগৌরব, সকলই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে বিদ্যমান ছিল। এ সংসারের সকল বস্তুরই একটা ভালর দিক আর একটা মন্দের দিক থাকে। কুলগৌরবাদি-প্রতি

ষ্ঠিত আভিজাত্যেরও ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ইহার প্রভাবে মানুষের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু দোষ ফুটিয়া উঠে। কুল, পদ, ধন ও বিদ্যা যেখানে একাধারে মিলিত হয়, সেখানে চরিত্রের একটা অসাধারণ শক্তি জাগিয়া থাকে। এরূপ পরিবারে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্যাভিমান, একটা খাতিরনদারৎভাব, একটা দেমাকের ঢং দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে আবার এ সকলের সঙ্গে একটা সংযম এবং শীলতাও মিশিয়া থাকে। এরূপ আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রায়ই আত্মস্থ থাকে, আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না। সকলে যাঁহাদের কথা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া চলে, তাঁহারা অপরের কথায় কান দিবার প্রবৃত্তির অনুশীলন করিবার প্রয়োজনবোধ করেন না। সকলে যাঁহাদিগকে মানিয়া চলে, তাঁহারা লোকমতের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে শিখেন না। তাঁহাদের মধ্যে একটা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বাভিমান বা অনধীনতার ভাব আপনি জন্মিয়া যায়। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা পর্য্যন্ত সহজ এবং নির্ভীক হইয়া থাকে। সমাজের ভয় যে কি বস্তু, ইহা প্রায়ই তাঁহারা জানে না। এই সকল যে কেবলই গুণের কথা, তাহাও নয়; ইহা দোষের কথাও হয়। কিন্তু এই জাতীয় দোষগুণ মিলিয়াই এ সংসারে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র লোক-নায়ক-চরিত্র গঠিত হয়। এই জাতীয় দোষগুণ দু'ই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়াছে। এই চট্টোপাধ্যায়বংশের অহঙ্কারের তেজে, শুনিয়াছি, লোকে তাঁদের কাছে ঘেসিতে সাহস পাইত না। আবার অন্যপক্ষে যাঁহারা এই ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাঁহারা ইহাঁদের সৌজন্যে এবং অমায়িকতায় চিরদিন মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট তাঁর নিজের প্রতিভারই ফল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর চরিত্রের তেজ, তাঁর অসাধারণ আত্মনির্ভর ও ব্যক্তিত্বাভিমান বা পারসনালিটি (personality),—তাঁর দেমাক, তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা

এসকলকে যে তাঁর পারিবারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা এন্‌ভাইরণ-মেণ্ট্ সৃষ্ট বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবারে না জন্মিলে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র হইতেন কিনা, বলা যায় না। যাঁরা মানুষের জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাঁরা এরূপ ভাবিতেও বা পারেন; হিন্দুর জন্মতত্ত্ব যাঁরা বুঝেন, তাঁদের পক্ষে এরূপ ভাবা সম্ভব নহে।

জীবের জন্ম ও কর্ম্ম-কথা।

ইউরোপীয় লোকেরা জীবের জন্মটাকে একটা অহেতুক, আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, ইহা জানি। ইংরাজি ভাষায় এইজন্য accident of birth বলিয়া একটা কথা আছে। আমাদের ভাষায় তার অনুরূপ কোন কথা নাই। আমরা কস্মিনকালেও মানুষের জন্মটাকে এরূপ একটা অকারণ, আকস্মিক কার্য্য বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। সৃষ্টির কোথাও যে কিছু অকারণ ও আকস্মিক, কোনও কিছু অন্ধঘটনাসম্পাত হইতে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, হিন্দু কোনও দিন এমন অদ্ভুত কল্পনা করে নাই। মানুষের জন্ম তার কর্ম্মের ফল। যার যেমন কর্ম্ম, সে সেই কর্ম্মোচিত দেহলাভ করিয়া সেই কর্ম্মফলের ভোগ এবং ক্ষয় করিবার জন্যই সংসারে আইসে। আর যে পিতার বীজে, যে মাতার গর্ভে, এই উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদান আছে, জীবের কর্ম্ম তাহাকে সেইখানেই টানিয়া আনে। আজিকালিকার ইউরোপীয় জীব-বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধি কিম্বা ল' অব ন্যাচার্যাল সিলেক্সন্—Law of Natural Selection—বলে, তাহা যে জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে দখল করিয়া তার বিকাশ-ক্রমকে নিয়মিত করে, এমন নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বা ন্যাচার্যাল সিলেক্সনের অর্থ এই যে প্রত্যেক জীব-কোষাণু সর্ব্বদা, সকল অবস্থাতেই আপনার জীবনরক্ষার ও বিকাশসাধনের অনুকূল যাহা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া চলে, যাহা ইহার প্রতিকূল তাহাকে প্রাণ-

পণে বর্জ্জন করিতে চাহে। এই গ্রহণ ও বর্জ্জন লইয়াই জীবের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানও একথা বলে না। জীব-কোষের উৎপত্তি হইতেই এই সংগ্রাম চলিতে আরম্ভ করে। মায়ের গর্ভে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার আরও পূর্ব্বে এই জীবকোষ যখন পিতার শুক্রেতে, মাতার শোণিতে বীজাবস্থায় থাকে, তখনও এই সংগ্রাম চলে। জীববিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম লক্ষিত হয়। যাহা জীব-বিজ্ঞান দেখে না ও জানে না, সেখানে কি এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম নাই? হিন্দুর কর্ম্মবাদ এই জীববিজ্ঞানের অতীত ও অজ্ঞাত ভূমিতেও এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। এই জীবন-সংগ্রাম, এই গ্রহণ ও বর্জ্জন-চেষ্টা জীবের নিত্যধর্ম্ম। যেখানে জীব, সেই-খানেই এই প্রয়াস রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান যাহাকে জীবন বলে, জীবের জন্মের পূর্ব্বে তার এই জীবন থাকে, না থাকে না? যদি না থাকে, তবে জন্মকালে এ বস্তু আসে কোথা হইতে? অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, ইউরোপের জীববিজ্ঞানও আজি পর্য্যন্ত একথা সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। অজীব-জনন-বাদ বা abiogenesis এর মত এখনও প্রমাণপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজেও এই মতটাই প্রবল রহিয়াছে। জীবদেহটাকেই যদি সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীব বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে পিতৃমাতৃ দেহ হইতে এই জীবের উৎপত্তি হয়, এই কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই দেহতত্ত্বেতে জীব সম্বন্ধে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ত হয় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই আমাদের শাস্ত্রে অন্নময়কোষ বলিয়াছেন। অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, কল্পনা করাও কঠিন। এই দেহের উপরে প্রাণ। এই প্রাণ বস্তু কি, কে বলিবে? এই প্রাণকে দেখি না, শুনি না, ধরি না, ছুঁই না, কোনও ইন্দ্রি-

য়ের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ ইহা সকল দেহ ও সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপিয়া আছে। দেহ ছাড়া জীবের কেবল প্রাণই যে আছে, তাহাও নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, অহঙ্কার আছে, আর সকলের উপরে অহংপ্রত্যয়-বাচক একটা বস্তু আছে, যাহাকে আমরা তার আত্মা বলি, যে বস্তু তার জীবনের অনিত্যতার মধ্যে নিত্য, তার মৃত্যুর মধ্যে অমৃত; সে বস্তু তার জীবনের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের চিরসঙ্গী ও চিরসাক্ষী হইয়া আছে। নিত্যের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মেও সে থাকে, জন্মের পূর্ব্বেও থাকে, মৃত্যুকালে সে'ই মৃত্যুরও সাক্ষী, মৃত্যুর পরেও সে থাকে। আজি-কালিকার বিজ্ঞান যাহাকে হেরিডিটি বলে, তাহাও এই নিত্য বস্তু যে আত্মবস্তু, তাহারই এন্‌ভাইরণমেণ্ট বা আধার ও আবেষ্টন বা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। এই এন্‌ভাইরণমেণ্ট-সহায়ে এই আত্মবস্তু আপনার কর্ম্মকে ফোটাইয়া তুলে ও ক্ষয় করিয়া থাকে। এই আত্মা ভোক্তা; তার ভোগ আছে। এই ভোগের আবার ক্ষয় আছে। এই ভোগের জন্যই তার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। এই ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সে এই সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ করে। এই ভোগ এবং কর্ম্মই তার আত্মচরিতার্থতার বা self-realisationএর পথ। আমরা যে অবস্থাটাকে জীবের জন্ম বলি, তাহা লাভ করিবার জন্য পিতৃমাতৃ-নির্ব্বাচন প্রয়োজন। এই নির্ব্বাচনের নিয়ন্তা জীবের এই ভোগ-বাসনা ও এই সঞ্চিত কর্ম্ম। এখানেও উপায় উদ্দেশ্যের সংযোগ আছে। না থাকিলে, জন্মটা অর্থহীন, অন্ধঘটনা-সম্পাতে পরিণত হয়। জন্মের কোনও অর্থ আছে মানিলে, ইহার অন্তরালেও এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই "বার্থ্"টা আর একটা "অ্যাক্‌সিডেণ্টে" পরিণত হয় না। প্রাকৃতজনের পক্ষে যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ লোকোত্তরচরিতদিগের পক্ষে জন্মটা নিতান্ত একটা আকস্মিক ঘটনাসম্পাত বলিয়া মনে করা কঠিন। ইঁহারা

সংসারে যে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কর্ম্মের উপযোগী আয়োজন সংগৃহীত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহাদের বংশ-ধারা এই কর্ম্মের অনুকূল হয়। তাঁহাদের পিতৃমাতৃ-চরিত্র এই কর্ম্মোপযোগী গুণের বীজ তাঁহাদিগকে দান করে। তাঁহাদের পারি-বারিক ও সামাজিক ব্যবস্থানও ইহার উপযোগী হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও ইহাই দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মূল সরঞ্জামগুলি তাঁহার পিতামাতার, তাঁহার বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার অপূর্ব্ব যোগাযোগে তাঁর পিতৃপরিবার নিজেদের সমাজে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। কেবলমাত্র কুলগৌরবে বঙ্কিম-চরিত্রের অসাধারণ ঔদার্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিত না। কেবলমাত্র পদমর্য্যাদায় কিম্বা ঐশ্বর্য্য-প্রভাবেও আবাল্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক করিতে পারিত না। কেবলমাত্র বিদ্যার জোরেও তিনি, জীবদ্দশাতেই, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের রাজা হইয়া বসিতে পারিতেন না। যে স্ব-রাট নহে, সে সম্রাট হইতে পারে না। যার ভিতরে, কোনও দিকে, কিছু অপরিহার্য্য হীনতাবোধ থাকে, সে কখনওই স্বরাট হইতে পারে না। জন্মাবধি বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও বিষয়ে কাহারও নিকটে মাথা হেঁট করিতে হয় নাই; এইজন্যই তিনি প্রথমে নিজের স্বারাজ্য ও ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে, আপনার সহযোগীগণের মনের সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের আধুনিক-কালের অপরাপর চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে কেবল রাজা রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেই কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার এই অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। আর এইজন্যই রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর কেহ দেশের লোকের চিন্তা ও চরিত্রের উপরে এমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারেন নাই। এই তিনজনই স্ব-রাট ও সম্রাট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের কথা যতটা শোনা যায়, তাহাতে

তাঁর বৈজিকধারা বা হেরিডিটি যে অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখি না। যে জমিতে এই বীজ পড়িয়াছিল, অর্থাৎ তাঁর পিতৃ-পরিবারের অবস্থা ও ব্যবস্থাও এই বীজকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার বিশেষ উপযোগী ছিল বলিয়াই মনে হয়। তারপর তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল। সে সময়কার নব্য-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর পক্ষে যতটা উদার ও উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করা সম্ভব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাইয়াছিলেন। তখন এদেশের ইংরাজি-শিক্ষার বাল্যাবস্থা বলিলেও চলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তিনি সেকালকার সিনিয়ার স্কলার্শিপ পাশ করিয়াই লেখাপড়া শেষ করিতেন। কিন্তু তাঁর অধ্যয়নসমাপ্তির প্রাক্কালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া বি, এ, উপাধিদানের আয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কয়েকদিন মাত্র বি, এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া, পরীক্ষা দিতে গমন করেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার শেষ হয় নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিত্য নূতন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সেবা কেবল সখের ব্যাপার ছিল,—যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের উপস্বত্ব নিতান্ত কম দাঁড়ায় নাই। কিন্তু অন্য কোনও দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সখের সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তিনি যতটা শ্রমস্বীকার করিতেন, তাঁর পরবর্ত্তী কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যিক এ পর্য্যন্ত ততটা শ্রমস্বীকার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ তথ্যের সন্ধানে, বিশেষ বিষয়ের গবেষণায়, কেহ কেহ ইদানীং আপনাদের সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়া যাই নাই। জগদীশচন্দ্রের বা প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বা অক্ষয় মৈত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান, এ সকল নিতান্ত সখের

ব্যাপার বা amateur work নহে। ইঁহারা আপনাপন বিদ্যার অনুশীলনে বিস্তর শক্তি ও সময় নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসাহ সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে ইঁহাদের যতই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে যে অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায়, ইঁহাদিগকে সেই অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায় না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, এ সকলই ইঁহাদের মূল সাধ্য—সাহিত্য নহে। ইঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সাধ্য ছিল। বিস্তৃত অর্থে, বিজ্ঞান ইতিহাসাদিও সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে লোকে সাহিত্য বলিতে মৌলিক রসসৃষ্টিই বুঝিয়া থাকে। রসবস্তু ভিতরের। আন্তরিক রসানুভূতির উপরে এই রসের প্রতিষ্ঠা। শব্দাত্মক, বা বর্ণাত্মক, বা ধ্বন্যাত্মক, কিম্বা মৃণ্ময়, কি ধাতুময়, কি প্রস্তরময় চিত্রাদির সাহায্যে এই আন্তরিক রসানুভূতিকে সম্যক্‌রূপে বাহিরে ফুটাইয়া তুলাই সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য্য, প্রভৃতি ললিতকলার উদ্দেশ্য। এইজন্য সচরাচর, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সাহিত্যিকেরা অন্তরের রসানুভূতির অনুশীলনে যতটা তৎপর হইয়া থাকেন, বাহিরের জগতের বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ততটা যত্ন করেন না। বাহ্যবস্তুর সহিত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ যে কতটা ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, মানুষের জ্ঞান ও ভাবের যে একটা অনন্যাপেক্ষীত্ব আছে, বিষয় বিশেষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনের গতি ও প্রকৃতি যে বদলাইয়া যায় এবং এই কারণে বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বহির্বিদ্যার আলোচনা ও প্রচারের দ্বারা আন্তরিক রসানুভূতির প্রকার এবং শক্তিও যে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এ সকল কথা মামুলী সাহিত্য-সেবাতে বড় একটা গণনার মধ্যেই আসে না। আর এই কারণেই আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি অনেক সময় কেবল স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যই

লাভ করে, পারমার্থিক সত্য লাভ করা ত দূরের কথা, ব্যবহারিক সত্যের উপরেও যথাযোগ্যভাবে গড়িয়া উঠে না।

সাহিত্যের সাধনা।

মানুষকে লইয়াই ত সাহিত্য। মানুষের মন লইয়াই ত সাহিত্যের যাবতীয় লীলাখেলা। মানুষের ভাবকে আকার দিয়া, রং দিয়া, আদিতে ও মূলে যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, সংকেতে, উপমায়, রূপকে সাজাইয়া কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে টানিয়া আনাই সাহিত্যের লক্ষ্য। মানুষ আপনার অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে সকল অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান লাভ করে, তাহাকে জগতের অশেষবিধ জ্ঞাত বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে অনুমান উপমানাদির দ্বারা যুক্ত করিয়া, জ্ঞানগোচর করিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টি আপনার যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। ইংরাজি ফান্সি (Fancy) শব্দকে যদি আমরা বাঙ্গালায় কল্পনা বলি, তাহা হইলে ইংরাজিতে যাহাকে ইমেজিনেষণ (imagination) কহে, তাহাকে আমাদের ভাষায় অপরোক্ষ অনুভূতি বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। সাহিত্যে এই সত্য কল্পনা বা ইমেজিনেষণকেই আমি অপরোক্ষানুভূতি বলিতে চাই। এখানে এই অর্থেই অর্থাৎ ইংরাজি ইমেজিনেষণের প্রতিশব্দরূপেই, অপরোক্ষানুভূতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এই অন্তরঙ্গ-অনুভূতি, এই অতীন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জ্ঞান বা রসবোধই ইমেজিনেষণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কখনও জানা যায় না তাহাকে ব্যক্ত করাই এই অপরোক্ষানুভূতির বা অন্তরঙ্গ-অনুভূতির কর্ম্ম। এইজন্যই এই অনুভূতি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল মন্ত্র।

——as imagination bodies forth,
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

ইহাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু মানুষের অজ্ঞাতকে ধরিবার শক্তি ও প্রণালী সর্ব্বদাই সে যাহা ও যতটুকু জানে, তাহার উপরেই নির্ভর করে ও তাহারই দ্বারা নিয়মিত হয়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুইটা একান্ত বিচ্ছিন্ন রাজ্য নয়। জ্ঞাত যাহা তাহা অজ্ঞাত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু সেইরূপ আলোক যাহা তাহাও ছায়া নহে, ছায়া যাহা তাহা আলোক নহে, একথাও সত্য এবং প্রত্যক্ষ। অথচ ছায়া আর আতপকে পরস্পর হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ছায়ার পাশেই আতপ, আতপের সঙ্গেই ছায়া সর্ব্বদা থাকে। সেইরূপ জ্ঞাত এবং যাহাকে অজ্ঞাত বলি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা এবং যাহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলি, ইহারা উভয়েও সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়াই যেন থাকে। গুণকে যেমন গুণী হইতে, চিন্তাতে পৃথক্ করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে কদাপি পৃথক্ দেখা যায় না; সেইরূপ যাহা জানি, তাহা হইতে কিছুতেই যাহা জ্ঞানাতীত ও অজ্ঞেয় তাহাকে আলাহিদা করা সম্ভব হয় না। এইজন্যই বহির্বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্যোপলব্ধি এবং আনন্দানুভূতি বা রসানুভূতির প্রকৃতি ও প্রসার উভয়ই বাড়িয়া যায়। দেহের জ্ঞান যত বাড়ে, চৈতন্যের উপলব্ধি তত বিস্তৃত ও গভীর হয়। এই জ্ঞানপ্রভাবে দেহের উপরে মানুষের আধিপত্য যত বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে তার রসসম্ভোগের মাত্রা এবং বৈচিত্র্যও বাড়িয়া যায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের রসানুভূতিও পরিপক্কতা ও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য অনন্যাপেক্ষীত্ব আছে। সেইরূপ জ্ঞানের এবং ভাবের বা রসের,—সায়েন্স্ (Science) এবং আর্টের—মধ্যেও একটা অনন্যাপেক্ষা রহিয়াছে। আপনার যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া, কিম্বা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, গভীর, প্রাণগত, প্রত্যক্ষযোগ রক্ষা না করিয়া, কোনও সাহিত্যই সত্য ও শ্রেষ্ঠ রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা এই অতি মামুলী ও মোটা কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি

বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই বাঙ্গালা দেশে সত্য সাহিত্য-সৃষ্টি যেন ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশে আজিকালি বিজ্ঞানচর্চ্চা বাড়িয়াছে, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক গবেষণা বেশ হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ মৌলিকতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। এ সকল বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের ধারা যেন ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যসৃষ্টি যেন কেবলই একটা অলীক অন্তর্মুখীনতার অভিনয়ে ব্যস্ত হইয়া, বিমানচারিণী হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্য-কলায় কেবলই যেন একটা আবছায়ার লীলা আরম্ভ হইয়াছে!

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য ও বিদ্যাবত্তা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এটি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সাহিত্যের সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতন বাঙ্গলা সাহিত্য এতটা পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এইজন্য যে সেকালের বাঙ্গালী লেখকেরা প্রায় সকলেই, আপনাদের সমসাময়িক শিক্ষা ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গকেই স্বল্পাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গলা শব্দযোজনা আজিকালিকার মতন তখন এত সহজও ছিলনা; আর যে সুললিত শব্দযোজনা করিতে পারিত, সে'ই, সেই ঝঙ্কার-সম্পদের বলে, একটা দীগ্‌গজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশা লইয়া পাঠকসমাজেও আসিয়া দাঁড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকেই হয় স্বয়ং সিদ্ধ, না হয় কৃপা-সিদ্ধ। সাহিত্য-সৃষ্টির যে একটা বিশেষ, কঠোর সাধনা আছে, এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল। তাঁর পূর্ব্বে অক্ষয়কুমারকে এবং ঈশ্বরচন্দ্রকেও কঠোর সাধনাপথে সাহিত্য-জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল। সেকালের হিসাবে অক্ষয়কুমারের বিস্তর পড়াশুনা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কত বিস্তৃত পড়াশুনা ছিল তাঁর গ্রন্থাদিতে তার যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর

সংগৃহীত পুস্তকরাশিতে তদপেক্ষা বেশী পরিচয় পাই। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর কাহাকেও এদেশে খুঁজিয়া পাই না। সে সময়ের ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে, তাঁর জীবদ্দশায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর একটিও পণ্ডিতলোক বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বলিয়া জানি না। তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্র এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি তিনি যে নিজের বিদ্যা জাহির করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহটা মনে জাগে না। আপনার সৃষ্টিকে সাজাইবার কিম্বা নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রয়োজনমত অপরের প্রামাণ্য বা উদ্ভাবিত সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও নিজের বিদ্যার গৌরবপ্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। বিদ্যা তাঁর প্রতিভার কিঙ্করী হইয়াই ছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রভু হয় নাই। বিদ্যা তাঁর যতই বেশী হউক না কেন, প্রতিভা এই বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে বড় ছিল। আমাদের শিক্ষিত-সমাজ আজিকালি কল্‌চারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে কোলাহলায়িতও হইয়া উঠে। বঙ্কিম-"মণ্ডলে" এ স্ফীতমস্তকের বা এ কোলাহলের উৎপাত দেখা যায় নাই; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যে পড়াশুনা ছিল, এখন তার কিছুই নাই বলিলে চলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা তাহা একেবারেই হজম করিতে পারিত। অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতু যেমন টাঁকশালে এক আকারে যায়, কিন্তু সেখান হইতে আর এক আকারে বাহির হইয়া আইসে, সেইরূপ অধীত বিদ্যাসকল একভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যাইত, কিন্তু অন্য আকারে তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়া আসিত। জীব-মাত্রেরই বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রয়োজনীয় তাহাকে

নিজের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিবার ও যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাকে উৎসর্জ্জন করিবার শক্তি থাকে। এই শক্তিই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষণ। মনেরও এই ধর্ম্ম আছে। যে মনের এই জীবন-ধর্ম্মটি আছে, সে যেমন অনায়াসে বাহিরের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ আহরিত বিষয়ে যাহা নিষ্প্রয়োজন বা হানিকর, অর্থাৎ যাহা তার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে না, তাহাকে বর্জ্জনও করিতে পারে। যে মন এইরূপ বর্জ্জনক্ষম নহে, তাহা অজীর্ণ-বিদ্যার উৎপাতে শীর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যা তার মানসিক শক্তিবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তাহার হ্রাস এবং অপচয়ই করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজীবনে কোনও দিন কেহ এ অজীর্ণরোগ দেখিতে পায় নাই। পড়াশুনা তাঁর মধ্যে যে সার্থকতালাভ করিয়াছিল, অতি অল্প লোকের মধ্যেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ লোকের মধ্যেও পাওয়া যায় না, পণ্ডিতদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন তত্ত্বটা জানিতেন না, এদেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এদেশের বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদিস্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবী, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণমহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলিতে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যাণ্ট, হেগেল্, কুজেঁা, কোম্‌টে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্‌সার্, মিল্, বেন্থাম, হক্‌স্‌লি, টিণ্ডেল্, ফ্রেডারিক্ হ্যারিসন্ প্রভৃতি, আর একদিকে মেথু আর্‌নল্ড্, রেনাঁ প্রভৃতি, এমন কি আধুনিক প্রেতত্ত্ব বা spiritualism এবং মেসমেরিজম্ (mes-

merism) পর্য্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল,—এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। নিজের শক্তির উপরে যে দাঁড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মৌলিকতা যে বুঝে, সে পরের বস্তু লইয়া বড়াই করিতে যাইবে কেন? স্বারাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাতি বা জয়শ্রী ধার করিয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহাতে যে তার ইজ্জৎ যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চক্র বা চড়ক্

(১)

অবিরাম-গতি লভি'
ঘুরে পরমাণু, বিশ্ব, গ্রহ, তারা, রবি ;
রাশিচক্র, নীহারিকা,
ঘুরে ধূমকেতু—পুচ্ছে বাষ্পময়ী শিখা ;
ষড় ঋতুচক্র ঘুরে—
শীতাতপভেদ স্ফুরে ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"—

(২)

শৈশব বার্দ্ধক্যে পূরে—
কর্ম্মফল ল'য়ে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরে ;
সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তন,
ঘুরে জন্মমৃত্যু-ধারা—উত্থান-পতন ;
ঘুরে ফিরে সৃষ্টি—নাশ,
হ্রাস বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হ্রাস ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

(৩)

স্থূল সূক্ষ্ম—অনুক্রমে
জীব হ'তে ব্রহ্ম,—পুনঃ জীব মায়া-ভ্রমে ;
অংশ হ'তে পরিণাম,
পূর্ণ হ'তে খণ্ড পুনঃ—ক্রম অবিরাম ;
তরু হ'তে বীজ ভ্রূণ,
বীজ হ'তে তরু পুনঃ ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

(৪)

কালমূলে মহাকাল
ঘুরাইছে চক্রনেমি—আবর্ত্ত ভয়াল !
ঘৃষ্ট-পিষ্টে জীব মরে,
'দয়া নাই—স্নেহ নাই'—কাঁদে আর্ত্তস্বরে ;
বল তারে অবিচার,
নিয়ামক নির্ব্বিকার ;—
অই শুন ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত *

আমি যে আজ আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, সে ঠিক আমার দোষে নহে। আমারই কয়েকজন ছাত্রবন্ধু ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছেন; তাঁহারা আপনাদের সমিতির সভ্য, সুতরাং আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পরে আপনারা তাঁহাদিগকে এজন্য যেরূপ ইচ্ছা শাসন করিতে পারিবেন। আমি এই প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের নাম করিয়া দোষী হইতে পারিব না, কিন্তু সে সকল ষড়যন্ত্রকারী, অনাবশ্যকরূপে ব্যস্ত, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিতে প্রস্তুত, হারুন-উল-রসীদের মত মেজাজের লোক দেখিলেই আপনারা কলেজের ছাত্র বলিয়া নিশ্চিত চিনিতে পারিবেন। তাঁহারা যে আমাকে কলিকাতার যাদুঘর হইতে ভবানীপুরের মানবপিতামহশালায় কেন টানিয়া আনিয়াছেন, ইহার একটি সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কার করিতে এতদিন চেষ্টা করিতেছিলাম। যাঁহারা প্রায় ৩৬৫ দিন আমার বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আবার এ নূতন সখ কেন মনে আসিল, তাহাই আমি ভাবিতেছিলাম। ইহা আমার বক্তৃতারই আকর্ষণী শক্তি, এরূপ মনে করিবার মত হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানশূন্যতা, অনেকের থাকিলেও, আমার নাই। এতদপেক্ষা যুক্তিযুক্ততর অনুমান এই যে ইঁহারা আমার বক্তৃতা তেমন ভাবে কখনও শুনেন নাই—নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই 'শতকরা' রক্ষা করিয়া সারিয়া আসিয়া থাকেন, পদ্মপত্রস্থ বারির ন্যায় একেবারেই অনাসক্ত! যাক্, যে কারণেই হউক, আজ এই নববর্ষের প্রথম দিনে

---

* ১৩২২, ১লা বৈশাখ তারিখে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

আপনাদিগকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতে আসিয়াছি. আপনারা অতিথির সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোনও সভা সমিতিতে এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধরূপে পঠিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আপনারা যদিচ বিষয় নির্ব্বাচনে আমার সহিত এক-মত হইতে না পারেন, তথাপি আমার মৌলিকতা আপনারা অস্বী-কার করিতে পারিবেন না। যেহেতু যতদূর জানা যায় তাহাতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সভাস্থলে কোনও বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই। আপনারা যদি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা একটুকু মাপ করেন, তবে আমি প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। বর্ত্তমান যুগে, মৌলিকতার ন্যায় আদরণীয় জিনিস কিছুই নাই। আপনারা যদি ভবানীপুরের সহিত রাণী ভবানীর কোনও যোগ দেখাইতে পারেন, আলিবর্দ্দী খার সহিত আলিপুরের কোনও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বাহির করিতে পারেন, কালীঘাটের মন্দিরে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন খুঁজিয়া পান, অগত্যা এটা স্থির করিতে পারেন যে শশার আঁশে অতি মোলায়েম কাগজ প্রস্তুত হয়, বা বিড়ালের লোমে বিচিত্র শাল হয়, তাহা হইলে আপনাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক বা না হউক, আপনাদের মৌলিকতার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্যকার এই সান্ধ্য সম্মিলনে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও, ভ্রমণে বড় একটা নূতনত্ব আর নাই। আজকাল প্রায়ই একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের অন্যতম পেশা ভ্রমণ। বায়ু-সেবনই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। যেখানে সাধারণতঃ মাছ-মাংস, ঘি সস্তা এই বায়ু-ভোজনকারীদিগের গন্তব্য স্থান সেই সকল দেশ। বারাণসীতে বেণীমাধবের ধ্বজা বা সারনাথ অপেক্ষা দশাশ্ব-মেধের বাজারে মৎস্যের দরই ভ্রমণকারীদিগের অধিকতর প্রিয়।

বায়ুভোজীদিগের প্রাণ-বায়ুর ন্যায় হাল্‌কা, আহার্য্য বায়ুর অপেক্ষা অনেকগুণ ওজনে ভারী এবং গতি আশুগতিরই ন্যায় দ্রুত এবং হিসাবের বাহিরে।

ভ্রমণের উপকারিতা অনেক: নিষ্কর্ম্মাদিগের কর্ম্ম ভ্রমণ, বহুকর্ম্মাগণের অবসর-বিনোদন ভ্রমণ এবং যাঁহাদের কর্ম্ম তত বেশী নহে, তাঁহারা কর্ম্মের ভাণ করিয়া যদি পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন মন্দ হয় না। ভ্রমণের আর একটি উপকারিতা এই যে যাঁহাদের অর্থবাহুল্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে ভ্রমণ Safety valveএর কাজ করে। অর্থের ন্যায় ভ্রমণ ও অঘটন-ঘটন-কুশল। সাত ঘাটের জল একত্র করিতে ভ্রমণ অদ্বিতীয়। এই প্রখর গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের নির্ব্বাত উত্তাপে নেহাত যদি তোমার দম আটকাইয়া আসে, তবে চট্ করিয়া পুরীতে কি ওয়ালটেয়ারে সরিয়া পড়, ঝড় বহিয়া তোমার সমস্ত ক্লেশ হরণ করিবে। যদি গ্রীষ্মের ফল আম, তরমুজ, পটলে তোমার অরুচি হইয়া থাকে, তবে ঝাঁ করিয়া একবার দারর্জ্জিলিংও ঘুরিয়া এস, কপি, মটরশুঁটি, কমলা ইত্যাদি শীতকালের ফল তোমার রসনা পরিতৃপ্ত করিবে।

এ সকল জাগতিক ভোগবাসনা যদি না থাকে, তবে লোটা ও কম্বল লইয়া জলধর দাদার মত গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা কর। ফিরিয়া আসিয়া একখানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিও কিছু পয়সা হইবে।

আমি একটি কথা আপনাদিগকে সবিনয়ে বলিয়া রাখিতে চাই যে আমি অতদূর যাইতে পারি নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় আপনাদের বেশী দূরে স্থিত নহে। অল্পদিন হইল আমি বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম, তাহারই একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আপনাদের সমীপে পেশ করিব বলিয়া আজ আমার এই সযত্ন-প্রয়াস। দূরত্ব বেশী নহে বলিয়া আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। আজকাল সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বেশ আদর আছে বলিয়া মনে হয়। আমি বিলাত বা

তিব্বত না গিয়া থাকিলেও, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কতকগুলি সাধারণ ঘটনা আমার এই সামান্য বর্দ্ধমান-ভ্রমণেও ঘটিয়াছিল যথা দৈনিক একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চা-পান, বহুবার জলপান ইত্যাদি। একখানি ম্যাপ ও খানকয়েক ছবি দিয়া সাজাইয়া দিলে যে কোনও মাসিক পত্র আমার এই বর্দ্ধমান-ভ্রমণ-কাহিনী যত্নসহকারে গ্রহণ করিবে, এখন কেবলমাত্র গোটাকতক চটকদার ঘটনা জুটাইতে পারিলেই হইল। সম্প্রতি একখানি মাসিকপত্রে একজন মহিলা নরওয়ে-ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জাহাজের প্রত্যেক রমণীই নিতান্ত পলিত গলিত না হইলে—কাহারও না কাহারও সঙ্গে প্রেম-সূত্রে বাঁধা পড়িতেছেন। একজন মহিলার লেখনী হইতে এমনতর চটকদার ঘটনাসম্বলিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যে নিতান্ত মারাত্মক, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বর্দ্ধমান নরওয়ে হইতে কিছু নিকটে—আমার অসুবিধা ঠিক এইখানে। কিন্তু তাহাতে উপেক্ষার বিষয় কিছু নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি এই বর্দ্ধমান-ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পুস্তকখানি যে এক সুরসাল ভ্রমণকাহিনী তাহা হয় ত অনেকে জানেন না।

নরওয়েই হউক, আর বর্দ্ধমানই হউক, ভ্রমণ ভ্রমণই। পৃথিবী অনন্ত শূন্যে নিরলসভাবে অবিরত তীব্র বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের এই 'জগৎ' অর্থাৎ একান্ত গতিশীল Solar Express ক্রমাগত চলিয়া আজ কিছুক্ষণের জন্য আপনাদিগকে ১৩২২ সালের দ্বারদেশে নামাইয়া দিয়াছে। ইহার উপর আবার শারীরিক ভ্রমণ আছে, শুধু প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের কথা বলিতেছি না, অহোরাত্র আমরা হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেই ভালবাসি। এই হাওয়া খাওয়ার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর এত বেশী যে, কোনও কাজ করিতে গিয়াও আমরা হাওয়া খাইয়া বসি। ব্যবসা বাণিজ্য হাওয়া খাইতে গেলে চলে না; কাজেই সেদিকে আমরা বড় একটা ঘেঁসি না। সনাতন পাণের

ডিপে, আর কাঁচিমার্কা সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ফেলিয়া আড়ং-ঘাটা হইতে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে Daily Passenger হিসাবে হওয়া খাইয়া বেড়াইতেই আমরা পটু।

তার পর, আমাদের মস্তিষ্কও নিতান্ত বসিয়া থাকে না। এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, আমরা নিয়ত ছুটিতেছি, আর্দালীসহ বড় সাহেব ছুটিতেছেন, তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক বেচারীও খুব ছুটি-তেছে। মস্তিষ্ক ঘুরাইতে পারি বলিয়া আমরা এখনও টিকিয়া আছি। তবে মাথাটা কিছু বেয়াড়া রকম ঘুরিয়া গেলেই যা' বিপত্তি।

হৃৎপিণ্ডটিও দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে, ঘড়ির কাঁটার মত একস্থানে নিবদ্ধ থাকিয়াও, চলিতেছে। তিলমাত্র বিরাম নাই। এইরূপ চলিতে চলিতে যেদিন Terminusএ পৌঁছিবে, সেইদিনই চলার শেষ। যতদিন Terminus না মিলিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য সকলকে মালগাড়ীর মত Sidingএ ফেলিয়া আগে চল, আগে চল ভাই।'

এইখানেই ভ্রমণের শেষ নহে। হিন্দুরা বলেন অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে জীব মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হিন্দুদের দর্শন, তন্ত্র ধর্ম্মনীতি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ইয়ুরোপীয়েরা বলেন যে হিন্দুদিগের সভ্যতার মূল মন্ত্র স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা নহে। এ কথা বলিলে আর গতি কি?

রেল ষ্টীমার বাইসিকেল না থাকিলেও সেকালে হিন্দুদের মনের গতি যে দ্রুত ছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্বভাবতঃই মনের গতি অতি দ্রুত। কিন্তু উহা ত আমরা লক্ষ্য করি না। মনের গতি ঠিক ঘুঁড়ির মত। নিদাঘের মধ্যাহ্নে রাখাল বালক একটি গাছের তলায় বসিয়া নিমীলিত নয়নে তাহার ঘুঁড়ির সূত্র-প্রান্ত হাতে ধরিয়া আছে। আর তাহার ঘুঁড়িখানি বাজিয়া বাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার মনে মুক্ত আকাশের সঙ্গে কত খেলাই খেলিতেছে। মনের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তই মানবজাতির ইতিহাস।

কথায় কথায় বৰ্দ্ধমান ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা হয়ত ব্যস্ত হইতেছেন, বৰ্দ্ধমানে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম তাহাও অন্ততঃ এতক্ষণ আপনাদিগকে বলা উচিত ছিল। বৰ্দ্ধমানে দেখিবার মত জিনিস আছে—রাজপ্রাসাদ সঙ্গিনের খোঁচার ভয়ে তাহা এ যাত্রা দেখিতে বিরত হইয়াছি। শের আফগানের এক সমাধি আছে, সময়াভাবে সে দিকে যাইতে পারি নাই। কতকগুলি বড় দীঘী আছে তাহার জল এমন কাল ও শীতল যে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। আর এক আছে গোলাপবাগ—বৰ্দ্ধমান রাজের চিড়িয়াখানা ও সম্ভ্রান্ত অতিথিশালা। সম্ভ্রান্ত অতিথির সহিত চিড়িয়ার কি সম্বন্ধ আছে—যে জন্য এতদুভয়ের একত্র অবস্থান ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার গবেষণায় আমি এতাবৎ কাল নিযুক্ত আছি।

গোলাপবাগ বেশীদূর দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে দুই বৃহৎ সর্প আমাদিগকে তাড়া করিল। বন্ধুবর রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, অশোক ধৰ্ম্মপদ প্রণেতা চারুচন্দ্র বসু ও আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম। বৰ্দ্ধমানরাজের চিড়িয়াখানায় এই সাপগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া খেলা দেখান হইতেছে, এ রহস্যটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না।

বৰ্দ্ধমান ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য আপনারা জানেন—অষ্টম সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিয়া সাহিত্যচর্চ্চার ও সীতাভোগ মিহিদানার সৎকারে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন। সাহিত্যের সঙ্গে প্রকৃত রসের এবম্বিধ সুমধুর সম্মিলন এই অষ্টম অধিবেশনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য অনেক দর্শক ও প্রতিনিধি বৰ্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মিলনের বৈঠকে খুব লোক সমাগম হয় নাই। মণ্ডপে পাছে স্থান সংকুলান না হয়, এজন্য সূক্ষ্মদর্শী মহারাজ প্রতিনিধিবর্গের আবাসস্থলে প্রচুর খাদ্য ও পেয়ের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় সেইগুলির প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া অনেকে সম্মিলনের বৈঠকে আসিবার

অবসর করিতে পারেন নাই। হয়ত পরবর্ত্তী সম্মিলনে চেষ্টা করিবেন।

বর্দ্ধমানের সম্মিলন মহাসম্মিলন নামে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহার সভাপতি মহামহোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ, জনতাও এক মহাগুরুতর ব্যাপার। সম্মিলনের চারিটি শাখা ছিল—'চতুস্কন্ধেব সা চমূ'। একটি শাখার অধিপতি ছিলেন অদ্যকার বিনি সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমিও অধিকাংশ সময় ইঁহার শাখায় বিচরণ করিয়াছি। কিন্তু যতই হউক, দর্শনশাখা তেমন জমে না। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, ন্যায়ের ষোড়শ প্রথা, বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ং, বের্গসনের ইনটুইশন, অয়কেনের আধ্যাত্মিকতা শুনিয়া শুনিয়া অরুচি ধরিয়া গেল। সাহিত্যশাখায় অনেক উপভোগ করিবার বিষয় ছিল। সাহিত্যে অন্ততঃ নয়টি রস আছে—ইচ্ছামত সেগুলিকে বাক্যজালে ফেলিয়া, ফেনাইয়া ছানিয়া নিরনব্বইটি করিয়া লওয়া যায়। সাহিত্যবিভাগে সেইজন্য বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের মত আমোদের সঙ্গে অনেক উপদেশ ছিল। কেহ ঘুষি বাগাইয়া বীররসে বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ বা নাকিস্বরে করুণরসের অবতারণা করিতেছেন, আর সভাপতির ঘণ্টাধ্বনি Summary-বিচারে অধিকাংশ বক্তৃতার অভিনন্দন করিতেছে।

সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ব্যোমকেশবাবু অন্যের রচিত কবিতা পাঠকালে তাহার সঙ্গে যথেষ্ট মৌলিকতা মিশাইয়া দিতেছেন। কারণ অধিকাংশস্থলে তিনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কবিরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

ইতিহাস শাখার বল্লালসেনের দেবগ্রাম লইয়া সাত আটশত বৎসর পরে আবার যুদ্ধঘোষণা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ শাখার অধিনায়ক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার অতিকষ্টে শ্বেতপতাকা উড্ডীন করিয়া দিনকয়েকের মত Truce করিয়া দিয়াছেন।

বিজ্ঞানশালায় একটি ফল ফলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে—কাশিম-

বাজারের মহারাজা ভারতীয় পদ্ধতিতে জ্যোতিষের আলোচনা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন।

সম্মিলনে একটি বিষয় আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই বলিয়া আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ করিব। তাহাও এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। সম্মিলনে দেখিলাম সভাপতি ব্যতীত সকলেই ভ্রমণ-পরায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সাহিত্যসেবিগণ ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া যুগপৎ সম্মিলনের কার্য্যের আছকৃত্য ও পরিপাক ক্রিয়ায় সৌকর্য্য সাধন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভ্রমণের গতিকে সম্মিলনটি নিতান্তই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বক্তারা যেমন স্ব স্ব প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র, অপরদিকে শ্রোতৃগণও তেমনি ভ্রমণ করিতে পটু। আমিও যথারীতি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যখন আমার ডাক পড়িল, তখন রুমালে উপচক্ষু পরিমার্জ্জিত করিয়া নিতান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে সেই চলিষ্ণু জনমণ্ডলীকে দেখিয়া লইলাম। প্রবন্ধ শুনাই কাহাকে? প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ শুনিয়া শুনিয়া সভাপতি ততক্ষণে উপনিষৎ-তত্ত্বে সম্ভবতঃ মনোনিবেশ করিয়াছেন। দুই চারিজন বন্ধু কৃপাপরবশ হইয়া স্থাণুর ন্যায় আসন পরিগ্রহ করিয়া রহিলেন, অবশিষ্ট ভ্রমণশীল। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবন্ধ পাঠ সুরু করিয়া দেওয়া গেল। দর্শকগণ—শ্রোতা নহে—আমাদের কক্ষে এক একবার একটু থামিয়া কক্ষান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেহ হাই তুলিয়া বক্তার প্রতি চাহিয়া বুঝাইয়া দিলেন—জগৎ নশ্বর। কেহ কেহ বা গতিশীল অবস্থাতেই করতালিতে যোগদান করিয়া জানাইতে চাহিলেন যে কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই।

এই প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিয়া আমি সেই ভ্রাম্যমাণ জনপুঞ্জকে আরও পরিভ্রমণের অবকাশ দিয়া সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক জৈন মত খণ্ডন

অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারার্থ শঙ্করাচার্য্য আধুনিক ভারতবর্ষের বাহিরে বর্ত্তমান পারস্যরাজ্যস্থিত বাহ্লিক দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। বাহ্লিক (Balkh) দেশে অবস্থানকালে একদা তিনি শিষ্যদিগের নিকটে স্বীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জৈন বা আর্হত মতাবলম্বী কতিপয় পণ্ডিত তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিচারের বর্ণনা পাঠকের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য আমি প্রথমে সংক্ষেপে আর্হত বা জৈন মতের বর্ণনা করিতেছি। "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" এ বিষয়ের মোটামোটি আলোচনা আছে।

জীব এবং অজীব

আর্হত মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ,—চিৎ বা বোধাত্মক জীব, এবং অচিৎ বা অবোধাত্মক বা জড়াত্মক অজীব। জীব ত্রিবিধ,—সংসারী, মুক্ত, এবং নিত্যসিদ্ধ। আর্হত বা জিন নিত্যসিদ্ধ। অন্যেরা কেহবা সাধনাদ্বারা মুক্ত, কেহবা বদ্ধ। যাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে, তাহারাই বদ্ধ বা সংসারী। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক এবং অমনস্ক। যাহারা শিক্ষা, ক্রিয়া এবং আলাপাদি গ্রহণে সমর্থ তাহারা সমনস্ক। যাহারা তাহার বিপরীত তাহারা অমনস্ক। অমনস্ক জীব দুই প্রকার,—'ত্রস' বা চলনশীল এবং 'স্থাবর'। শঙ্খ কৃমি প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের অন্ততঃ দুইটি ইন্দ্রিয় আছে তাহারা 'ত্রস' বা চলনশীল। 'ত্রস' চারি প্রকার, অর্থাৎ দুই, তিন, চার, অথবা পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং বনস্পতি সকল স্থাবর। পৃথিবীকে

যে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে কি করিবে, সেই পৃথিবীকায়ক বা পৃথিবীজীব। জল বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

"জীবাকাশ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্গলাস্তিকায়"

আর্হত সিদ্ধান্তে নিত্য এবং অনিত্যাত্মক তত্ত্ব কাহারো কাহারো মতে সপ্ত, কাহারো কাহারো মতে নব,—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সম্বর, বন্ধ, নির্জ্জরণ এবং মুক্তি। বোধাত্মক জীব এবং অবোধাত্মক অজীবের যোগে জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং পুদ্গলাস্তিকায়,—এই পঞ্চ প্রকার ভেদযুক্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি। কালত্রয় সম্বন্ধ হেতু স্থিতিবাচক 'অস্তি' শব্দ এবং অনেক প্রদেশবর্ত্তীত্ব হেতু শরীরবাচক 'কায়' শব্দ—উভয়যোগে অস্তিকায় শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায়, একত্বশালী (singular, not generic terms) এবং নিষ্ক্রিয়। ইহারা দ্রব্য সকলের দেশান্তর প্রাপ্তির কারণ। অবস্থিতি এবং গতি ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত। প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মাস্তিকায়ের এবং স্থিতি দ্বারা অধর্ম্মাস্তিকায়ের অনুমান হয়। যেখানে এক বস্তু আছে সেখানে অন্য বস্তুর প্রবেশের নাম 'অবগাহ', এবং তাহা আকাশের কার্য্য। আকাশাস্তিকায় দুই প্রকার,—লোকাকাশ এবং আলোকাকাশ। উপর্য্যুপরিস্থিত লোকসকলের মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান তাহার নাম লোকাকাশ। তাহাদের উপরিস্থিত মোক্ষ স্থানের নাম আলোকাকাশ। পুদ্গলাস্তিকায় স্পর্শ, আস্বাদন, এবং বর্ণযুক্ত। তাহা দুই প্রকার—অণু এবং স্কন্ধ। যাহা ভোগের অবিষয় তাহাই অণু। দ্ব্যণুকাদি ভোগ্য বস্তুই স্কন্ধ। দ্ব্যণুকাদির ভঙ্গ বা বিগলনে অণুর উৎপত্তি, এবং অণুসকলের পরস্পর যোগে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি। পূর্ণ করে অর্থাৎ গঠন করে, এবং বিগলিত বা ভগ্ন করে, এজন্য বলা হয় পুদ্গল। সৎকর্ম্ম পুদ্গলের নাম পুণ্য, তাহার বিপরীত পাপ।

শরীরের চলনে আত্মার চঞ্চলত্ব। যাহাকে 'যোগ' বলে,

তাহাই আশ্রব। যে জলমধ্যগত দ্বার দিয়া নদীর জল স্রবিত বা বহির্গত হয়, তাহাকে 'আশ্রব' বলে। সেইরূপ কর্ম্ম সকলও 'যোগরূপ' প্রণালী দ্বারা আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয়, এজন্য যোগেরই নাম 'আশ্রব'। আর্দ্র বস্ত্র যেরূপ বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আহৃত ধূলিকণা সকল গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ কষায় বা পাপরূপ জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া, যোগরূপ বায়ু দ্বারা সর্ব্বপ্রদেশ হইতে আনীত কর্ম্মসকল গ্রহণ করে। কুগতি প্রাপ্তি দ্বারা আত্মার কর্ষণ অর্থাৎ হিংসা করে, এজন্য ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভকে 'কষায়' বলা যায়। অহিংসাদিকে শুভ কায়যোগ এবং সত্য, মিত, এবং হিত ভাষণাদিকে শুভ বাক্‌যোগ বলা যায়। কায়া মন এবং বাক্যের সহিত কর্ম্মের যোগের নাম আশ্রব। পুণ্যের আশ্রব শুভ এবং পাপের আশ্রব অশুভ।

"আশ্রব"

মিথ্যা দর্শন, অবিরতি, প্রমাদ এবং কষায় হেতু 'যোগ' দ্বারা আত্মা নানা স্থান হইতে কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত পুদ্গল সকল স্বীয় সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে গ্রহণ করে, এবং আপনাতে যোগ করে, তাহাকেই 'বন্ধ' বলে। বন্ধ নানা প্রকার, তন্মধ্যে প্রকৃতিবন্ধ বা কর্ম্মবন্ধ আবার অষ্ট প্রকার,—(ক) জ্ঞানাবরণীয়, অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানলাভেও মোক্ষসিদ্ধি হয় না, যেহেতু জ্ঞানদ্বারা বস্তু লাভ হয় না,—মনের এরূপ ভ্রম ধারণা। (খ) দর্শনাবরণীয়, অর্থাৎ আর্হতদিগের "দর্শন" অভ্যাসদ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয় না—এরূপ ভ্রম। (গ) 'বেদনীয়', অর্থাৎ কোন বস্তু যুগপৎ আছে এবং নাই মনে করিলে অসিধারাতে মধুলেহনের ন্যায় মনে যে যুগপৎ সুখ এবং দুঃখের উদ্রেক হয়। (ঘ) 'মোহনীয়', অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব তাহাদিগেরও জ্ঞানাভাব—এইরূপ ভ্রম —অথবা তত্ত্বালোচনায় অশ্রদ্ধা, এবং অসংযত চরিত্র। (ঙ) আয়ুস্ক, অর্থাৎ দেহধারণের প্রতি আসক্তি। (চ) নামিক, অর্থাৎ স্বীয় নামেতে অহঙ্কার। (ছ) গোত্রিক—বা স্বীয় গোত্রে অভিমান।

বন্ধ

(জ) অন্তরায়—দানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কাতরতা, অথবা দানাদিকে মোক্ষলাভের বিঘ্নকর জ্ঞান। ইহারই নাম কর্ম্মাষ্টক। জৈনমতে এই কর্ম্মাষ্টকের ক্ষয়ে মুক্তির উদয়।

পূর্ব্বোক্ত আশ্রবের নিরোধের নাম সম্বর। সম্বর দ্বারা আত্মাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ হয়। সম্বর নানা প্রকার; যথা, গুপ্তি, সমিতি ইত্যাদি। কায়-মনোবাক্যের নিগ্রহ দ্বারা সংসার-গতির কারণ-ভূত আশ্রব হইতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম 'গুপ্তি'। প্রাণীগণের পীড়া পরিহার পূর্ব্বক সঞ্চারণের নাম সমিতি। সংসার-গতির কারণ আশ্রব এবং মোক্ষলাভের কারণ সম্বর।

সম্বর

তপঃ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের নির্জ্জরণ বা ক্ষয় সাধনের নাম নির্জ্জরা। নির্জ্জরার প্রভাবে এই দেহ দ্বারাই চিরপ্রবৃত্ত পাপপুণ্য এবং সুখদুঃখের ক্ষয় সাধিত হয়। সংসারের বীজভূত কর্ম্মসকলকে নিঃশেষরূপে জরণ বা পরিপাক করে, এইজন্য ইহাকে নির্জ্জরা বলা হয়। নির্জ্জরা দ্বিবিধা,—কামাদি পাকজা এবং কর্ম্ম-নির্জ্জরা। কর্ম্ম স্বীয় ফলদান করিলে পর স্বভাবতঃই কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহার নাম "কাম পাকজা নির্জ্জরা।" আর তপস্যার বলে কর্ম্ম স্বয়ংই যখন মুক্তিলাভরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হয়, তখন সেই কর্ম্মকেই "কর্ম্ম-নির্জ্জরা" বলা যায়।

নির্জ্জরা

মিথ্যা দর্শনাদি বন্ধ-কারণের নিরোধ-হেতু অভিনব কর্ম্ম-প্রবাহের নিরোধ, এবং নির্জ্জরা দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কর্ম্মবন্ধ হইতে যে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। মৃত্তিকালিপ্ত অলাবু (লাউ) জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সেই অলাবু মৃত্তিকা হইতে মুক্ত হইলে পুনরায় জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। আত্মাও সেইরূপ কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত হইলে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনন্তত্ব ধর্ম্ম হেতু ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, কারণ অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধগতিই আত্মার স্বভাব।

মোক্ষ

আর্হতগণকে একপ্রকার সংশয়বাদী (Sceptic) অথবা অনির্ব্বাচ্যবাদী (Agnostic) বলা যায়। আর্হতগণ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী, কারণ তাহারা বলেন, যদি কোন স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে লৌকিক কর্ম্মফল ভোগের নিয়ম বিকল হয়। একজন কর্ম্ম করে, আর একজন তাহার ফল ভোগ করে, এরূপ সম্ভব নয়। তাহা হইলেও আর্হত মতে বস্তুর স্বভাব সত্ত্ব কি অসত্ত্ব ঠিক্ বলা যায় না। এজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার মত প্রচলিত :—সৎবাদ, অসৎ-বাদ, সদসৎ-বাদ, এবং অনির্ব্বচনীয়-বাদ। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার মত আছে, তাহা সদাসদাদি বাদ-চতুষ্টয়ের সহিত অনির্ব্বচনীয় বাদের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার তাহারা যখন কোন বস্তু আছে কি নাই বলেন—সেই সঙ্গে তাহারা "কথঞ্চিৎ" অর্থে 'স্যাৎ' বা 'ইয়ৎ' শব্দের যোগ করেন—কারণ তাহারা অনৈকান্তিকত্বের (non-absolutism) পক্ষপাতী,—যথা 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি। তাহাদের উপদেশ যে, যখন কোন বস্তু আছে বলিতে চাও, তখন বলিবে "কোন প্রকারে হয় ত আছে"—'স্যাদস্তি'। যখন কোন বস্তু নাই বলিতে চাও, তখন বলিবে "কোন প্রকারে হয় ত নাই"—'স্যান্নাস্তি'। স্যাৎ শব্দ এস্থলে অনৈকান্তত্বদ্যোতক অথবা কথঞ্চিৎ বোধক। ইহারই নাম 'স্যাদ্বাদ'। স্যাদ্বাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বথা 'একান্ত'-ত্যাগ। যখন কোন বস্তু সম্বন্ধে বাদী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে, সেই বস্তু কি আছে ? তখন হয় ত 'কোন প্রকারে আছে'—'স্যাদস্তি' এই উত্তর শ্রবণে সে লজ্জায় নীরব হয়। তাহাতেই স্যাদ্বাদীর জয় নিশ্চিত। অন্যান্য মতাবলম্বীর পক্ষ-প্রতিপক্ষ আছে, কিন্তু স্যাদ্বাদী অপক্ষপাতী, কারণ সকল প্রকার মতই তাহার নিকট সমান। এই স্যাদ্বাদকেই জৈনগণ সর্ব্বদা "সপ্তভঙ্গীনয়" নামে উল্লেখ করেন। একান্ততা ত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয় "সপ্তভঙ্গীনয়" তাহাই প্রদর্শন করে, যথা (১) 'স্যাদস্তি', 'হয় ত আছে',

সপ্তভঙ্গীনয় অথবা 'স্যাদ্বাদ'।

(২) 'স্যান্নাস্তি,' 'হয় ত নাই', (৩) 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ', 'হয় ত আছে অথচ নাই'; (৪) 'স্যাদবক্তব্যং', 'হয় ত বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৫) 'স্যাদস্তি চাবক্তব্য', 'হয় ত আছে কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৬) 'স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য', 'হয় ত নাই কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৭) 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্য', 'হয় ত আছে এবং নাই তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না'। এই 'স্যাদ্বাদ' দুই প্রকার প্রমাণ মাত্র স্বীকার করে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

জিন বা আর্হতই জৈনদিগের দেবতা এবং গুরু। তাহাদের মতে তিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। বৌদ্ধদিগের যেমন বুদ্ধ, জৈন-দিগের পক্ষেও সেইরূপ জিন বা আর্হত। জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—(১) শ্বেতাম্বর, এবং (২) দিগম্বর।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের যে বিচার হইয়াছিল, মাধবাচার্য্য তাহা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন,—

আর্হত। জীব (বোধাত্মক), অজীব (জড়াত্মক), আশ্রব (ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম), শ্রিতবৎ (মিথ্যা বা অশুভ প্রবৃত্তি), সম্বর (শমদমাদি শুভ প্রবৃত্তি), নির্জ্জর (পুণ্যাপুণ্য নাশের সাধন), বন্ধ এবং মোক্ষ এই সপ্ত প্রকার পদার্থ, এবং অস্তি-নাস্তি ইত্যাদি সপ্ত-ভঙ্গীনয় কেন স্বীকার কর না।

শঙ্কর। হে আর্হত, তোমাদের মানিত জীবাস্তিকায়ের স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা কর।

আর্হত। হে বিদ্বন্, জীবাস্তিকায় দেহেরই ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং কর্ম্মাষ্টক দ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টিত।

শঙ্কর। জীব যদি দেহের সমান পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা বড়ও না হয়, ছোটও না হয়, তবে ত জীব ঘটাদিরই তুল্য। তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় জীবও নিত্য হইতে পারে না। আবার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন গজদেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে,

তখন সে সমগ্র গজদেহ কিরূপে অধিকার করিবে? অথবা যখন পতঙ্গদেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে, তখন সমগ্র জীব কিরূপে তাহাতে সমাবেশ লাভ করিবে?

আর্হত। জীব যখন কোন ক্ষুদ্রতর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে নূতন অবয়ব লাভ করে; এবং যখন কোন বৃহত্তর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন জীব তাহার অবয়বের কতক অংশ পরিত্যাগ করে। এইরূপে জীব যখন যে দেহ ধারণ করে, তখন তত্তৎ দেহের সহিত তাহার সমব্যাপ্তি হেতু জীব সেই সেই দেহের সমানই থাকে।

শঙ্কর। যদি শরীরের ন্যায় জীবের পক্ষেও অবয়বের সমাগম এবং অপগম সম্ভব হয়, তবে শরীরাবয়বের জড়ত্বের ন্যায় সেই সকল জীবাবয়বেরও জড়ত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত হয়। সেই সকল অনাত্মভূত অবয়ব কিরূপে জীবের মধ্যে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করিবে?

আর্হত। সেই সকল অবয়বও জন্ম বা ক্ষয় রহিত, কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও অপ্রকাশিত থাকে। হস্তী প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্তই প্রকাশিত হয়, আর পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্ত প্রকাশিত হয় না।

শঙ্কর। বল দেখি সেসকল অবয়ব চেতন কি অচেতন? যদি চেতন হয়, তবে যেহেতু অবয়ব সকল অনেক, এবং তাহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, অতএব সেইসকল চেতন অবয়বের পরস্পর বিরোধ হেতু শরীর উন্মথিত হইবে। আর যদি জীবাবয়ব সকল অচেতন হয়, তবে তাহাদের যোগে শরীরে চৈতন্যলাভ অসম্ভব। অচেতন অবয়বকে জীবাবয়বই বলা যাইতে পারে না।

আর্হত। হে বিদ্বন্, অনেক অশ্ব যেমন একমত হইয়া একটি রথ চালনা করে, সেই রূপে জীবাবয়বসকলও বিরোধরহিত হইয়া চৈতন্য-যোগ দ্বারা শরীর-চালনারূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করুক।

শঙ্কর। হে সুমতে, সারথিরূপে অশ্বসকলের উপরে একজন চালক থাকে বলিয়াই অনেক অশ্ব একমত হইয়া রথ-চালনা-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। কিন্তু এস্থলে তোমাদের কল্পিত অবয়বসকলের উপরে সেরূপ কোন নিয়ামকের অভাব হেতু ঐকমত্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আর্হত। হে যতিরাজ, জীবাবয়বের তাদৃশ উপগম অথবা অপগম নাইবা হইল। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। জলৌকা যেমন অবলীলাক্রমে কখনও সঙ্কুচিত এবং কখনও বা প্রসারিত হয়, জীবও সেইরূপ বৃহত্তর শরীরে প্রসারিত এবং ক্ষুদ্রতর শরীরে সঙ্কুচিত হয়।

শঙ্কর। জড়পদার্থের ন্যায় জীবের পক্ষে যদি আকুঞ্চন-প্রসারণাদি বিকার ভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে জীব ও ঘটাদি অপরাপর জড়বস্তুর ন্যায় নশ্বর হইবে। জীব নশ্বর হইলে কৃতের নাশ বা সদ্বস্তুর অসত্তা, এবং অকৃতের অভ্যাগম বা অসদ্বস্তুর সত্তা সম্ভব হয়। আবার এরূপ হইলে সংসার-সাগরে নিমগ্ন স্বকর্ম্মাষ্টকভারে পীড়িত জীবের পক্ষে জলমগ্ন অলাবুবৎ সতত ঊর্দ্ধগমনশীলতারূপ জীবের মোক্ষলাভবিষয়ক তোমাদের সিদ্ধান্ত সাধিত হয় না। হে আর্হত, তোমাদের কথিত সপ্তভঙ্গীনীতিরও আমরা আদর করি না। কারণ সৎ এবং অসৎ এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাধারে যুগপৎ স্থিতি সম্ভব হয় না।

এইরূপে আর্হত বা জৈনগণ শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেন।

জৈন দার্শনিক

জৈন-দর্শন আমাদিগের নিকটে বৌদ্ধ-দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর অপরিচিত। অনেকের ধারণা যে, জৈন-দর্শন এবং ধর্ম্ম বৌদ্ধ-দর্শন এবং ধর্ম্মেরই শাখা বিশেষ। জৈনগণও বোধ হয় ভিন্ন সম্প্রদায়ীদিগকে তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার অধিকার এবং সুবিধা প্রদানে অনিচ্ছুক। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, আত্ম-

তত্ত্বের অনুশীলনে এবং আত্মার বিকাশসাধন বিষয়ে জৈনগণ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের মতের এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন,—"স্রোতঃ-সন্তাননিত্যতান্যায়েনাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ" (২-২-৩৫), 'নদী-প্রবাহের নিত্যতার ন্যায় আত্মার নিত্যতা' (compare Emerson's "No man can see the same thing twice") এই কথার ভিতরে আমরা বৈদান্তিকদিগের সোপাধিক এবং নিরোপাধিক (কূটস্থ) ভেদেরই কতক আভাস পাইতেছি। অধ্যাত্ম ধর্ম্মসাধনা বিষয়ে জৈনদিগের আদর্শ যে কত উচ্চ তাহা তাঁহাদের পদার্থ-বিচার* পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হয়। মোক্ষ সম্বন্ধেও জৈনমত প্লেটো (Plato) প্রভৃতি অতি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতেরই অনুরূপ। মোক্ষবিষয়ক জৈনমত শঙ্কর এইরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি"— (২-২-৩৫)। (জ্ঞানাবরণীয়াদি) কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের মৃত্তিকাদ্বারা উপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃত্তিকার অপগমে ঊর্দ্ধারোহণের ন্যায়, কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদে জীবের ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। প্লেটো আত্মার ঊর্দ্ধগমনশীলত্ব পক্ষীর উপমা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, জৈন

---

* আস্রব সম্বর-নির্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণা। তত্র মিথ্যা প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। সম্যক্ প্রবৃত্তিতু সম্বরনির্জরৌ। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। অন্যে তু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুঃ। সেয়ং মিথ্যা প্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। শমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ। নির্জরস্বনাদি কাল প্রবৃত্তি কষায় কলুষ পুণ্যাপুণ্য প্রহানহেতুঃ বন্ধো ? ষটবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং। জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয়মন্তরায়ং। ঊর্দ্ধগমনশীলো হি জীবো ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকা যেন বন্ধশুদ্ধিমোক্ষাৎ যদূর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ"। ভামতী ২-২-৩৫৪ ॥

স্যাদিত্যব্যয়ং তিঙন্ত প্রতিরূপকং কথঞ্চিদর্থকং" রত্নপ্রভা।

দার্শনিক তাহাই মৃত্তুপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃদপগমে ঊর্দ্ধারোহণের উপমা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

শঙ্করাচার্য্য নিজে তাহার সূত্রভাষ্যে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদও এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের প্রতি কতদূর সুবিচার করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। শঙ্কর বলিতেছেন :—"দিগম্বর" বা জৈনমতে সাতটি পদার্থ,—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, এবং মোক্ষ। সংক্ষেপে দুইটি পদার্থও বলা হয়,—জীব (ভোক্তা) এবং অজীব (ভোগ্য), কারণ যথাসম্ভব অন্যসকল এই দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন তাহারা আবার পঞ্চ অস্তিকায় নামক প্রপঞ্চেরও বর্ণন করেন :—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায়। তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত এসকলেরও আরও অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন। আবার তাঁহারা সর্ব্বত্র এই সপ্তভঙ্গীনয় নামক ন্যায়েরও অবতারণা করেন :—(১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, (৪) স্যাদবক্তব্যঃ, (৫) স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদাস্তিচনাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব, নিত্যত্বাদি বিষয়েও তাহারা এই সপ্তভঙ্গীনয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা, স্যাদেকঃ, স্যাদনেকঃ, স্যান্নিত্যঃ, স্যাদনিত্যঃ ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে এরূপ মত সঙ্গত নয়। কেন? কারণ একই পদার্থে তাহা অসম্ভব। একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায় সদসত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব। আর তাহাদের যে সপ্ত পদার্থ তাহা যে সংখ্যক এবং যেরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত তাহা কি সেরূপই অথবা সেরূপ নয়? যদি নিশ্চয় করিয়া তাহা না বলা যায়, এবং তাহা যদি এরূপও হইতে পারে, এরূপ নাও হইতে পারে, তাহা হইলে

সূত্রভাষ্যে শঙ্করের কৃত জৈনমত খণ্ডন।

সংশয়ের ন্যায় এরূপ অনির্দ্ধারিত জ্ঞান প্রমাণের অযোগ্য। যদি বল যে বস্তু অনেকাত্মক হওয়াতে, যে জ্ঞান নির্দ্ধারিত আকারে উৎপন্ন হয় তাহা সংশয় জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ হইতে পারে না। আমরা বলিতেছি, তাহা নয়। যাঁহারা সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ অনেকান্তত্ব বা অনিশ্চয়তা স্বীকার করেন, বস্তুত্বাবিশেষত্ব হেতু তাঁহাদের সেই নির্দ্ধারণও স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে তাহাও অনির্দ্ধারণাত্মক বা সংশয়যুক্ত হইবে। এরূপ নির্দ্ধারণ-কর্ত্তার নির্দ্ধারণের ফল স্যাৎপক্ষে অস্তিতা এবং অস্যাৎপক্ষে নাস্তিতা হইবে। এরূপ হওয়াতে যখন সেই তীর্থঙ্করের প্রমাণ, প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতি সকলই অনির্দ্ধারিত, তখন তিনি প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপদেশ করিবেন কিরূপে? আর যাঁহারা সেই তীর্থঙ্করের উপদেশ অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই বা সেই অনির্দ্ধারিত-স্বরূপ উপদিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন কিরূপে? ফল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার সাধনের অনুষ্ঠানে লোকসকল অনাকুলচিত্তে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা হয় না। অতএব অনির্দ্ধারিতার্থক শাস্ত্র প্রণয়ন করাতে সেই তীর্থঙ্করদিগের বচন মত্ত বা উন্মত্তের বচনের ন্যায় গ্রহণের অযোগ্য। আর অস্তিকায়-পঞ্চকের পঞ্চত্ব সংখ্যা "অস্তিবা নাস্তিবা" এই পরস্পর বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে এক (বা স্যাৎ) পক্ষে হইতে পারে, এবং পক্ষান্তরে (বা নস্যাৎ পক্ষে) নাও হইতে পারে, তদ্দ্বারা সংখ্যার ন্যূনাধিক্যও সম্ভব হইতেছে। আর পদার্থসকলের অবক্তব্যত্ব বিষয়ে তাহাদের মত সম্ভব নয়। কারণ যদি প্রকৃতপক্ষে অবক্তব্যই হইত, তবে তীর্থঙ্করেরাও সেই সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। উক্ত হইতেছে, অথচ বলা হইতেছে অবক্তব্য! উক্ত হইতেছে, অতএব অবধারিত। অথচ বলা হইতেছে অবধারিত নয়! এসকল বিরুদ্ধ বাক্য প্রলাপতুল্য! তাহাদের অবধারণের ফল সম্যক্‌দর্শনও আবার "অস্তি বা নাস্তি বা", এবং তদ্বিপরীত অসম্যক্ দর্শনও "অস্তি বা নাস্তি বা!" এরূপ প্রলাপ মত্ত বা উন্মত্তের পক্ষেই শোভা পায়, বিশ্বাস-উৎপাদনেচ্ছু

উপদেষ্টার পক্ষে নয়। স্বর্গ এবং অপবর্গ সম্বন্ধেও এক দিকে ভাব, অন্যদিকে অভাব; এক দিকে নিত্যতা, অন্যদিকে অনিত্যতা, অবধারণের অভাব হেতু তৎপ্রতি লোকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার অনাদিসিদ্ধ জীব প্রভৃতিরও স্বভার তাহাদের শাস্ত্রে যেরূপ অবধারিত হইয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রমতেই সেই অবধারিত স্বভাবের বিপরীতও হইতে পারে। জীবাদি পদার্থের সম্বন্ধেও দেখা যায়—একই ধর্ম্মীর মধ্যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, অর্থাৎ সত্ত্বরূপ এক ধর্ম্ম থাকিলে অসত্ত্বরূপ অপরধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এবং অসত্ত্ব-রূপ ধর্ম্ম থাকিলে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এই আর্হত মত অসঙ্গত। ২·২·৩৩।

আবার পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন,—"একই ধর্ম্মীর মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অসম্ভব" (Law of contradiction) ইহা যেরূপ আর্হতা-দের একটি দোষ, সেইরূপ "জীবাত্মার অকার্ৎস্ন্য"ও আর একটি দোষ। সে কি? আর্হতেরা বলেন যে 'জীব শরীর-পরিমাণ" "শরীরপরিমাণোহি জীবঃ"—আত্মা যদি শরীর পরিমাণ হয়, তবে তাহা অকৃৎস্ন বা অসর্ব্বগত এবং পরিচ্ছিন্ন, অতএব ঘটাদির ন্যায় আত্মাও অনিত্য হওয়াই সম্ভব। আর শরীর-পরিমাণের স্থিরতা না থাকাতে মনুষ্য-জীব যখন মনুষ্য-শরীর-পরিমাণ হইয়া পুনরায় কোন কর্ম্মবিপাকে হস্তীজন্ম লাভ করে, তখন তাহা সমস্ত হস্তী-শরীরব্যাপী হইবে না। আবার সেই জীব যখন পতঙ্গজন্ম লাভ করে, তখন সমস্ত পতঙ্গদেহে সেই জীবের সমাবেশ হইবে না। একই জন্মেও কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের ভেদে এই দোষ সমানই। (যদি বল) তাহা হয় হউক। কিন্তু জীবাবয়ব অনন্ত, এবং ক্ষুদ্র শরীরে সেই অনন্ত অবয়ব সঙ্কুচিত এবং বৃহত্তর শরীরে তাহা প্রসারিত হয়।* তাহা হইলেও বলা আবশ্যক সেই অনন্ত

---

* টীকাকার দীপাবয়বের দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—"যথা দীপাবয়বানাং ঘটে সংকোচো গেহে বিকাশস্তথা জীবায়বানাং"।

জীবাবয়বের কল্পনা সমান-দেশত্বের কল্পনা দ্বারা ব্যাহত হয় কি হয় না? যদি বল যে ব্যাহত হয়, তবে পরিচ্ছিন্ন দেশে অনন্ত অবয়-বের সমাবেশ হইতে পারে না। যদি বল যে ব্যাহত হয় না, তবে যেহেতু একই অবয়ব সেই পরিচ্ছিন্ন স্থান পূর্ণ করিতে পারে তখন সেই পরিচ্ছিন্ন স্থানে অনন্ত অবয়বের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে জীবকে অণুমাত্রই বলিতে হয়। আবার জীবাবয়ব সকল শরীর-মাত্র-পরিচ্ছিন্ন (অতএব পরিমিত) হওয়াতে, তাহাদের অনন্তত্বের কল্পনাও অসঙ্গত।" ২-২-৩৪।

পরের সূত্রে শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"আবার পর্য্যায়ক্রমে হস্ত্যাদি বৃহৎ শরীর লাভে জীবায়ব উপগত হয় আর পুত্তিকাদি সূক্ষ্ম শরীর-লাভে জীবাবয়ব অপগত হয়—এই মতের বিরুদ্ধে বলা যাই-তেছে,—পর্য্যায়ক্রমে অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারাও জীবের দেহ-পরিমাণত্ব মত অব্যাহত ভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। কেন? কারণ তাহা হইলে আত্মা সম্বন্ধে বিকারাদি দোষের অনুমান সিদ্ধ হয়। অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারা দিবানিশি আপূর্য্যমাণ এবং অপক্ষীয়মান হইলে জীবের বিক্রিয়াবত্ত্ব অপরিহার্য্য। বিক্রিয়া-বত্ত্ব স্বীকার করিতে গেলে চর্ম্মাদির ন্যায় জীবের অনিত্যত্বের আশঙ্কা অপরিহার্য্য। তাহা হইলে (জৈনদিগের) বন্ধমোক্ষের মত, যথা,—কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত হইয়া (মৃত্তিকালিপ্ত) অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের সেই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হইলে, ঊর্দ্ধগামিত্ব লাভ হওয়া, বাধিত হয়। আর কি? উপগত এবং অপগত অবয়ব সক-লের উপগম এবং অপগম ধর্ম্মবত্ত্বহেতু শরীরাদির ন্যায় তাহাদেরও অনাত্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। আত্মার অবয়ব সকলের এরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে, কোন অপরিবর্ত্তিত নিয়ত-অবস্থিত অবয়ব-বিশেষই আত্মা হইবে, অথচ এইটিই সেই বলিয়া তাহার নিরূপণ করাও অসাধ্য। আর কি? যে জীবাবয়ব সকল আসিতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, আর যেসকল অবয়ব চলিয়া যাইতেছে

তাহারাই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে? তাহাও বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু জীব অভৌতিক, অতএব ভূতসকল হইতে জীবাবয়ব প্রাদুর্ভূত হয় এবং ভূতসকলেই বিলীন হয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন সাধারণ অথবা অসাধারণ জীবাবয়বের আধারও নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণাভাব। আর কি? আর এরূপ হইলে আত্মার পরিমাণ এবং স্বরূপ অনবধারিতই থাকিতেছে। কারণ যেসকল অবয়ব আসিতেছে এবং যাইতেছে তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। উল্লিখিত দোষ হেতু পর্য্যায়ক্রমে আত্মার অবয়বের উপগম এবং অপগমের মত গ্রহণ করা যায় না। আবার যদি বল পর্য্যায়ক্রমে পরিমাণের অনবস্থা সত্ত্বেও স্রোতঃসন্তান বা জলপ্রবাহের নিত্যত্বের ন্যায় আত্মারও নিত্যতা হইতে পারে। রক্তপট বা বৌদ্ধদিগের মতে বিজ্ঞানের অনবস্থা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসন্তান বা বিজ্ঞান-প্রবাহের নিত্যতার মতের ন্যায় দিগম্বর (জৈন) দিগেরও আত্মার নিত্যতা মত স্রোতঃসন্তান নিত্যতার ন্যায় হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর করা যাইতেছে:—সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি অবস্তু হয়, তবে (বৌদ্ধদিগের) নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদই দাঁড়ায় (যাহা জৈনগণ স্বীকার করেন না)। সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি বস্তু হয়, তবে (তাহা সন্তানী দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলে কূটস্থবাদ, এবং সন্তানী হইতে অভিন্ন হইলে) আত্মার অনিত্যত্ব এবং জন্মাদি বিকার দোষপ্রসঙ্গ, অতএব সন্তানাত্মপক্ষও তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত।" ২- -৩৬।

শঙ্কর আবার বলিতেছেন,—"আবার জৈনেরা মোক্ষবস্থাগত জীবের অন্ত্য পরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই অন্ত্য পরিমাণের ন্যায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আদ্য মধ্যম জীব-পরিমাণেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। এবং এই পরিমাণ ত্রয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ইতর বিশেষ থাকে না। তাহা হইলে জীবের এক নিত্য শরীর-পরিমাণতাই স্বীকার করিতে হয়, বর্দ্ধিত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত শরী-

রান্তরপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না। অথবা অন্ত্য জীব-পরিমাণের অবস্থিতত্ব বা নিত্যত্ব হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আদি এবং মধ্য অবস্থাদ্বয়েও জীবের পরিমাণ অবস্থিত বা নিত্যই হইবে। অতএব জীবকে নির্ব্বিশেষ ভাবে সর্ব্বদাই অণু অথবা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কারণে জীবের শরীর-পরিমাণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্র ২-২-৩৩ হইতে ৩৬।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বৈশাখী

যমুনার কালো জলে গাগরী ভাসিয়া যায়,
অঞ্চল লুটিছে নীরে সাঁঝের চঞ্চল বায়।
দূরে ডুবু' ডুবু' রবি, ধরার কনক-ছবি
মুছিয়া যেতেছে ধীরে মলিন আঁধার ছায়,—
কি ভাবে বিভোরা বালা কিছু না দেখিতে পায়!

২

কদম্বের শ্বেত রেণু কিশোরীর কালো কেশে
সুগন্ধ-পশরা নিয়ে উড়িয়া পড়িছে এসে'।
লুকায়ে কদম্ব-শাখে পিক্ কুহু কুহু ডাকে,
একে একে তারাগুলি চাহিছে মধুর হেসে,'—
কিছু না দেখিছে, হিয়া কোথায় গিয়াছে ভেসে'!

৩

দেখিতে দেখিতে ক্রমে আঁধার ঘনায়ে আসে,
গগনে নীরদমালা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ভাসে;
ক্রমে পড়ে বারিধার, সারা অঙ্গ ভিজে তার,—
তবু না চেতনা ফিরে বালার শরীর-বাসে,
না জানি পরাণ বাঁধা কি গভীর প্রেম-পাশে!

৪

পিছু হ'তে আসি বঁধু সহসা বাঁধিল বুকে,
তবু না চেতনা ফিরে, তবু নাহি কথা মুখে!
অমর পিরীতি তার না রহে যে দেহে ছার,
কেমনে ফিরিবে আর পরাণ পরশ-সুখে?
নেহারো চরণ ধরি' বঁধুয়া কাঁদিছে দুখে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ভাষার কথা

কিরূপ ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্য রচনা করিতে হইবে—ইহা লইয়া আজকাল মহা তর্কবিতর্ক চলিতেছে। দুই পক্ষের বড় বড় মহারথীগণ শরজাল-বর্ষণে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। দর্শকস্বরূপ আমরা নিরীহ পাঠক বেচারারা হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু নিরীহ পাঠক সম্প্রদায় যে এই ব্যাপারের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক শূন্য তাহা নহে। যুদ্ধে যাহারা যোগ দেয় না, সেই নির্লিপ্ত সাধারণ লোকদেরও যেমন যুদ্ধের পরিণামের সঙ্গে স্বার্থসম্বন্ধ আছে, বাঙ্গালী পাঠকদেরও তেমনই এই ভাষা-যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই পাঠকদের পক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই রচনা করিতে হইবে,—সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজি বা হিব্রুতে নহে; এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারো মতদ্বৈধ নাই। বাঙ্গলা ভাষার একটা নিজস্ব গতি, প্রকৃতি এবং চেহারা আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবে;—কাহারো কাছে ধার করিয়া বড়মানুষী করিবে না। গরিবের ছেলের নিজস্ব গরিবানা পোষাকটি সামান্য হইলেও, তাহাতেই তাহার আত্মসম্মান বজায় থাকে; আর ভিক্ষালব্ধ রাজবেশের জাঁকজমক তাহার দীনতাকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তাই মদনমোহনী, অক্ষয়কুমারী বা বিদ্যাসাগরী ভাষা সংস্কৃতের নিকট ধার করিয়া যে কৃত্রিম ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আমরা নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। বঙ্কিম যখন খাঁটী বাঙ্গলা মায়ের জিনিসটি দেখাইয়া দিলেন, তখনই আমরা আনন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু এখনকার তর্কটা এদিক্‌কার নহে। এখনকার তর্কটা হইতেছে প্রধানতঃ কথিত ও লিখিত ভাষা লইয়া। একদল লেখক বলিতেছেন, যে, তোমরা যে, লিখিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেছ, সে ভাষাটা নিতান্ত প্রাণহীন, কৃত্রিম, পোষাকী ভাষা। উহাতে সাহিত্য রচিত হইলে সে সাহিত্য প্রাণের জিনিস হইবে না—প্রাণহীন, সুদৃশ্য মর্ম্মরমূর্ত্তি হইয়া উঠিবে। সাধারণতঃ দৈনিক জীবনে মানুষে যে কথাবার্ত্তা বলে, তাহাই হইতেছে প্রাণের ভাষা। আর সাহিত্যে দেশের প্রাণের নাড়ীর সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে এই ভাষাতে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।

কথাটা শুনিয়া বোধ হয় যে যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যেন সমগ্র বাঙ্গলাদেশের লোকেরা একই রকম কথিত ভাষা ব্যবহার করে। সকলেই জানেন যে ঘটনাটা মোটেই তাহা নহে। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে নানা বিচিত্র কথ্যভাষা চলিত আছে। চট্টগ্রামী কথা ও রাঢ়ী কথা এক নহে; আবার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কথাও এক-রূপ নহে; এমন কি কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরের কথাও বিভিন্ন রকমের। আর এটা কেবল বাঙ্গলাদেশেরই বৈশিষ্ট নহে। পৃথিবীর সকল বৃহৎ দেশেই, বিভিন্ন প্রদেশের কথ্যভাষা ভিন্নরূপ। ইংলণ্ডেরও উত্তর ও দক্ষিণের ভাষা একরকম নহে। ফ্রান্সেও তদ্রূপ।

এখন যদি কথিত ভাষাই সাহিত্যে চালাইতে হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন প্রদেশের কথ্যভাষা চালাইতে হইবে? সক-লেরই নিকট নিজের নিজের কথ্যভাষা প্রিয়। সুতরাং শ্রীহট্ট বলি-বেন, আমার কথাটা চলুক; ঢাকা বলিবেন, আমার কথাই ভাল; আবার কলিকাতা বাঁকিয়া বলিবেন যে, আমি যখন রাজধানী, তখন আমারই দাবী বেশী। ভোট লইয়া যে এরূপ বিষয়ের সুমীমাংসা হইবে তাহাও সম্ভব নয়। সুতরাং সকল প্রদেশের লোকেই যদি নিজ নিজ কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে থাকেন, তবে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা একটু কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে নানা বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে "প্রাণ" জিনিসটা জাগিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যময় যে তখন কতকগুলি "প্রাণ"-রূপ ভূত মিলিয়া প্রাণান্তকর দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিয়া তুলিবে, তাহা বোধ করি আর খুলিয়া বলিতে হইবে না।

আসল কথা এই যে, কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা, অথবা হাল ফ্যাসানের কথায় আটপৌরে ও পোষাকী ভাষায় অল্পবিস্তর সকল দেশের সাহিত্যেই একটু প্রভেদ থাকে। সাহিত্যটা কাহারো ঘরোয়া জিনিস নহে—ইহা সাধারণের সম্পত্তি। কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় না, একাও উপভোগ করা যায় না। দশজনের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, দশজনে মিলিয়াই ইহার আনন্দ উপভোগ করিতে হয়। আর যে কাজটায় সাধারণ দশজনের সম্পর্ক, সেটা দশজনের মনের মতন করিয়াই করিতে হয়, নহিলে তাহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সকল কাজই নিজের রুচিমত করা যায় না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিজের ঘরের ভিতর নগ্নদেহে বসিয়া থাকিবার সকলেরই আমাদের বিধিদত্ত অধিকার আছে; কিন্তু তাই বলিয়া সভাসমিতিতে দশজনের সঙ্গে যখন মেলামেশা করিতে হয়, তখন একটু ভদ্রবেশেই বাহির হইতে হয়। নিজের ঘরে নিজে রোজই দগ্ধকচু খাইতে পারি, কাহারও তাহাতে কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু দুই দশজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিলে, গৃহলক্ষ্মীর একটু কষ্টস্বীকার করিতেই হইবে। বৈঠকখানায় বসিয়া নানা অসংলগ্ন বাজে কথা বলা যায়; কিন্তু সাধারণের কাছে কোন একটা কথা নিবেদন করিতে হইলে, একটু সাজাইয়া গুছাইয়া না বলিলে চলিবে না। ইহাতে "প্রাণের" অভাব প্রকাশ পায় না—কৃত্রিমতাও ব্যক্ত হয় না। দশজনের সঙ্গে প্রাণের যোগ, রসের যোগ রাখিতে হইলে, এইরূপই করিতে হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতার বা ঢাকার আটপৌরে ভাষায় রচনা করিলে চলিবে না।

তাহাকে সমগ্র বাঙ্গালীর সেব্য ও উপভোগ্য সার্ব্বজনীন বাঙ্গলা ভাষাতেই আকার দিতে হইবে। এখনকার লিখিত ভাষাই সেই সার্ব্বজনীন ভাষা। তা সে ভাষাকে পোষাকীই বল', আর কৃত্রিমই বল'। সাহিত্য "প্রাণ", আর ভাষা "দেহ"। প্রাণের পূর্ণপ্রকাশ করিতে হইলে দেহকে নীরোগ, সবল ও সুস্থ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার এমন একটা অদ্ভুত গঠন দিতে হইবে যে, তাহা সকলের অবোধ্য একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস হইয়া দাঁড়াইবে ইহা স্বীকার করিতে পারি না। সকল মানুষেরই রুচি প্রবৃত্তি অনুসারে নানারূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু কিছু সঙ্কোচের দরকার। সাহিত্যেরও তেমনিই একটা সমাজ আছে। এখানেও সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারই চলিতে পারে না; এখানে স্থান পাইতে হইলেও কিছু কিছু সংযম অভ্যাসের প্রয়োজন।

বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিস—আদরের জিনিস। ইহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা—তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে হইবে। ইহারই সাহায্যে তাহার শিক্ষা দীক্ষা সাধনার চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে হইবে। ইহাই তাহার জাতীয়তার ভিত্তি—ঐক্যের বন্ধন—মুক্তির সোপান। আজিকালিকার সঙ্কট সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তিতে দলাদলির খেয়ালে বা দম্ভের আনন্দে ভাগবাঁটোয়ারার বহাল করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সুমহৎ জাতীয় অমঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই সার্ব্বজনীন ভাষা ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন নাই। কিন্তু—কার "ভিন্ন গোঠ" সেকথা দীনবন্ধু মিত্র বহুপূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি

আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে কীট ও পতঙ্গাদির প্রকৃতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার উৎসাহ তেমন নাই। বোধ করি সেইজন্যই কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে হইলেই আমাদিগকে ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়। কোন ভারতীয় গ্রন্থে কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে তেমন কোন মৌলিক আলোচনা নাই। দুই একটি গ্রন্থ যাহা খোঁজ করিলে পাওয়া যায়, সেগুলিও আবার স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণের ফল নয়—নিছক অনুবাদ। বহু দিন হইতে ইউরোপে কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়াতে, ইউরোপীয় কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ কীট সম্বন্ধে বিস্তর নূতনজীবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। বিলাতে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা বিদ্যালয়ের ছেলেদের একটা খেলার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আমরা বিলাতী অনেক বিষয়েরই অনুকরণ করিয়া থাকি; এই অনুকরণের যুগে আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে এই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণটার অনুকরণ করিলে বোধ হয়, আমাদের বিস্তর উপকার ও উন্নতি হইতে পারে। অনুকরণটাকে আমরা অনেক রকমে অনেক দিক দিয়া রীতিমত আয়ত্ত করিতেছি; কিন্তু যেদিক দিয়া করিলে অনুকরণটা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতাকে ফুটাইয়া না তুলিয়া পক্ষান্তরে তাহার বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে, সেদিক্ দিয়া অনুকরণ-অভ্যাসটাকে আমরা এখনও তেমন ভাবে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করি নাই। ভাল বিষয় অনুকরণ করিতে গেলেই প্রথমে সফলতার পরিবর্ত্তে আমরা বিফলতার মূর্ত্তিই দেখি। কিন্তু সেইজন্য যদি নিরুদ্যম না হইয়া বরং নব উদ্যমের সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকি, অবশ্যই একদিন না একদিন সম্পূর্ণ সফলতালাভ করিতে পারিব। এই সত্য বহুক্ষেত্রে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। কোন ইংরাজি গ্রন্থের সহায়তা না লইয়াই আমরা সম্প্রতি কীটপতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। সুতরাং আমাদের পর্য্য-

বেক্ষণের মাঝখানে অনেক রকমের নূতনত্ব থাকিতে পারে। হয় ত সেগুলি কতকাংশে ঠিক, কতকাংশে ভুল। কিন্তু তাহা অনিবার্য্য। দেশের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বাদপ্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে আমরা ইউরোপীয় কীটতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছাকাছি পৌঁছাইতে পারিব। কীট ও পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে লাভ যে আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। একদল লোক কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে পারিবেন। অন্য দল, ইহাদের এই জীবন রহস্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারিবেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকজন ব্যক্তি এই কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-চন্দ্র দেব মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মহিন্তা মহাশয় মাঝে মাঝে 'প্রবাসীতে' কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন। নির্ম্মলবাবুর একটি মৌলিক প্রবন্ধ বিগত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। দেবেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুবাদ হইলেও, তাহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নির্ম্মলবাবুর নিকট হইতে আমরা ঐ শ্রেণীর আরও মৌলিক প্রবন্ধ পাইবার আশা রাখি।

আমরা যে শ্রেণীর পর্য্যবেক্ষণ-ফল বাহির করিয়া থাকি, তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ নয়, কিন্তু কীট ও পতঙ্গ-জীবনের বাহ্য পরিচয়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এইরূপ ভাবে কীটপতঙ্গের সহিত পরিচিত হইবার আবশ্যকতা যে নাই তাহাও নহে। যাহা হউক আমাদের পর্য্যবেক্ষণপদ্ধতি অত্যন্ত সাধারণ রকমের হইলেও, তাহার আবশ্যক আছে। নিম্নে আমাদের বিশেষ পরিচিত কীট, যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গে বিছা ও পশ্চিমবঙ্গে শুঁয়োপোকা বলা হয়, তাহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শুঁয়োপোকার সহিত আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ জ্বালা এবং দুঃখের মধ্য দিয়া হয় বলিয়া তাহার জীবনের সহিত অধিক গভীর ভাবে পরিচিত হইবার ইচ্ছা আমদের হয় না।

আমাদের বাড়ীর মা মাসী, কিম্বা ছোট বোন এবং দিদিরা এই পোকার প্রধান শত্রু—(যদিও বন্য জগতে কীটপতঙ্গের প্রধান শত্রু পক্ষী)—তাঁহারা শুঁয়োপোকা দেখিলেই উনানের গরম ছাই হাতায় আনিয়া বেচারির সমাধি দিয়া থাকেন। ফলে তাহার ভব-যন্ত্রণার সুদীর্ঘ মেয়াদ, অল্পক্ষণ-ব্যাপী সুতীব্র অগ্নি-জ্বালাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা এইরূপে শুঁয়োপোকাদের জীবনের যথার্থ আয়ুর মাঝখানে মৃত্যু-বজ্র নিক্ষেপ করি বলিয়া তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ অংশটুকু চক্ষে দেখি না।

বেশী দিনের কথা নয়, বছর দুইএক পূর্ব্বে, কালীঘাটে আমার কোন আত্মীয়ের বাসায় অবস্থানকালে একদিন প্রাতে গৃহাঙ্গণে একটি শুঁয়োপোকার দেখা পাই। আমি তাহাকে বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছি লক্ষ্য করিয়া একজন প্রবীণা আত্মীয়া আমায় দূর হইতে বলিলেন, "মেরে ফেল, মেরে ফেল, ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে লাগ্‌লেই গা জ্বালা করবে।" তাঁহার হাতে সে সময় কাজ না থাকিলে হয় ত বা তিনি তৎক্ষণাৎ পোকাটির দফা শেষ করিয়া দিতেন।

আমি গৃহকর্ত্রীর সদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া একটি দিয়াসেলাইর বাক্সের মধ্যে অতীব যত্নসহকারে, তাহাকে আটক করিলাম। আটক করিতে যাইয়া যে যত্ন এবং যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা যে কেবল পোকাকে নিরাপদ করিবার জন্য তাহা নহে, নিজের শরীরকেই বেশীর ভাগ নিরাপদ করা আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

দুই দিন অতীত হইলে দেখিলাম শুঁয়োপোকা লোপ হইয়া বাক্সের মধ্যে একটি ছোট পুত্তলী পড়িয়া আছে। এই পুত্তলীকে ইংরাজিতে pupa বলে। অষ্টম দিনের দিন এই পুত্তলী দীর্ণ করিয়া একটি ছোট প্রজাপতি বাহিরে আসিল।

ঐ ঘটনার পর আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত বহু শ্রেণীর শুঁয়োপোকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। সব শুঁয়োপোকার বিষয় এ

প্রবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্ত্তমান পোকার জীবন-ইতিহাসের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সাধারণতঃ বর্ষার সময় এই বিষাক্ত শুঁয়োপোকার প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রামের বাড়ীর চারিধার অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে বলিয়া ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে ও অন্যান্য জায়গায় পোকাগুলি আসিয়া পড়ে। ঐ সময় ইহারা খড়খড়ে শুখ্‌নো মাটির সন্ধান করে। পাখী প্রভৃতি পক্ষবিশিষ্ট জীব ইহাদের প্রধান শত্রু। শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছেন। সেটি অনুকরণ-শক্তি। ইহারা ধূসর মাটির বর্ণকে অনুকরণ করে বলিয়া পাখী সহজে আর ইহাদের ধরিতে পারে না। তার পর ঐ বিষাক্ত শুঁয়োগুলোও ইহার আত্মরক্ষার একটা প্রধান অস্ত্র।

কচি ঘাস ও অন্যান্য কোমল পাতালতাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু ইহারা যখন কীট জীবনের বার্দ্ধক্যে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর কিছু খায় না; চলা ফেরা বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধ এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর (sensitive) হইয়া বসিয়া থাকে। ইংরাজিতে এই সবিরাম অবস্থাকে pupal crysalis stage বলে।

এই সময় ইহারা সুকৌশলে স্বীয় অঙ্গের শুঁয়োপূর্ণ চর্ম্মাবরণকে নিজের শরীর হইতে ছাড়াইয়া আপনার কোমল দেহের চারিদিকে গুটাইয়া একটি ছোট দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ঐ দুর্গমধ্যে কীটটি অত্যন্ত কামল বোল্‌তার টোপের মত অনেকক্ষণ থাকিয়া অবশেষে বাদামী বর্ণের পুত্তলীতে পরিণত হয়। পুত্তলীর আবরণ বেশ শক্ত। পুত্তলীর রক্ষার জন্য দুর্গটি নির্ম্মিত না হইলে পিঁপ্‌ড়ে জাতীয় জীব পুত্তলীকে নষ্ট করিয়া নিজেদের উদর পূজার আয়োজন করিত। এ ছাড়া অতিরিক্ত বৃষ্টি আর আলোর অত্যাচারও ঐটুকু পুত্তলীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইত।

এই পুত্তলীর আকারে আট দিন * পর্য্যন্ত থাকিয়া নবম দিনে পোকাটি ধূসর বর্ণের একটি প্রজাপতির রূপ ধরিয়া পুত্তলী দীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে। এই শ্রেণীর প্রজাপতি নিশাচর। দিনের বেলায় ইহাদের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

* সময় সময় দশদিন পর্য্যন্তও পোকা পুত্তলীর অভ্যন্তরে থাকে, তবে সাধারণতঃ নবম দিনেই প্রজাপতি পুত্তলী দীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে।

মির্‌জা হোসেন আলী

[বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত]

এই মহাসভায় বাঙ্গলার সমস্ত বিদ্বজ্জন সম্মুখে আজ যে মহাত্মার পূত-চরিত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক, ভক্ত ও কবি-প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে তাঁহার নাম ও পরিচয় অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর নিকটই অজ্ঞাত। যদি কোন দিন ভগবদনুগ্রহে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী আলোচিত ও প্রকাশিত হয়, তবে সকলেই দেখিতে পাইবেন, কিরূপ একটি অমূল্য রত্ন এতদিন লোকচক্ষুর অগোচরে লুকায়িত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে জীবিত ও মৃত সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যিকের কথাই যথাযথ আলোচিত হইবার প্রথা ও সুযোগ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক উদীয়মান নব্য লেখকের ন্যায় কত মৃত ভক্ত সাধক ও কবির কাহিনী যে সাধারণের অপরিজ্ঞাত ও লোকচক্ষুর অগোচরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? পূর্ব্ববঙ্গে আজ জীবিতের যে দশা, মৃতেরও সেই দশা। সকলেই,

"সমাজের প্রান্তভাগে তাপিত অন্তরে জাগে
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?"

মনের আবেগে দুইটা কথা বলিয়া ফেলিলাম, আর বাজে কথা বলিয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য যে মহাত্মার কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নাম মির্‌জা হোসেন আলী। ইনি ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী বরদাখাত পরগণার ধোল্লাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেই অঞ্চলে একজন প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধ জমিদার ছিলেন। কোন বিশেষ ঘটনায় তাঁহার

জীবন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং মধ্যজীবনেই ভোগ-লালসা ও পার্থিব ধনসম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া ইষ্টচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সাধনপ্রণালীর এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যাহা সকলের শুনিবার যোগ্য। তিনি হিন্দুর কৈবল্যদায়িনী কালীমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং সর্ব্বদা কালীপূজা ও কালীগুণকীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতগুলি তৎকালে সকলের মুখে মুখে গীত হইত এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকটই আদৃত হইত। এই সব সঙ্গীত-গুলি যদিও অলঙ্কার ও বাক্যচ্ছটাবিহীন, কিন্তু ভক্ত সাধকের প্রাণের কথা বলিয়া ভাবসম্পদে পূর্ণ ও উপভোগের সামগ্রী। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ও সমগ্র সঙ্গীতগুলি যদিও সংগৃহীত হয় নাই, সত্য কথা বলিতে কি, আজ পর্য্যন্তও কেহই ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের জীবনকথা যাহাতে আর সাধারণের নিকট অজ্ঞাত না থাকে, তজ্জন্য কি জানি প্রাণে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। কৃতকার্য্য হইব কি না ভগবান জানেন, তবে চেষ্টা করিবার বাসনা রহিল।

সাধক মির্জ্জা হোসেন আলীর সঙ্গীতগুলি পলাশীর যুদ্ধের কিছু-কাল পরে রচিত, কিন্তু প্রায় সমগ্র সঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষাই অতি বিশুদ্ধ। মির্জ্জা হোসেন আলীর সম্বন্ধে এদেশে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রবাদ যাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি তাহা সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। মির্জ্জা সাহেব কি করিয়া কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হন সে সম্বন্ধে প্রবাদ এই ;—তিনি একদিন বাহির বাড়ীতে কাছারীঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় পক্ক কাঁটালের গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি সভাষদ্‌গণের নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। পরিশেষে মির্জ্জা সাহেব একজন সমাগত জ্যোতিষী ও সাধককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিলেন, "আপনার জমিদারীর অন্তর্গত অমুক গ্রামের অমুক আজ তাহার

পিতার বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতেছে, ইহাতে সে পক্ক কাঁটাল দিয়াছিল, আপনি ইহারই গন্ধ পাইয়াছেন। কারণ আপনি পূর্ব্ব জন্মে এই ব্রাহ্মণ বালকের পিতা ছিলেন।” মির্জ্জা সাহেব কথাটা তত বিশ্বাস করিলেন না এবং অনুসন্ধানার্থ নিজে ছদ্মবেশে কথিত বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসান্তে অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ বালক প্রকৃতই সেদিন কাঁটাল দিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছে। পরে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর তারিখ অনুসন্ধানে জানিলেন যে ইহা মির্জ্জা সাহেবের জন্মগ্রহণের কিছুপূর্ব্বে। তিনি আর নিজের পরিচয় ও আগমন উদ্দেশ্য না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে তাহার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ নিয়মিতরূপে করার জন্য একটি তালুক প্রদান করিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার মনে বিষয়-বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা হয় এবং কি করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন, তজ্জন্য আকুল প্রাণে ঘুরিতে থাকেন। কিছুকাল ভ্রমণের পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সব্‌ডিবিসনের নিকটবর্ত্তী ভাতুঘর গ্রামের ৺কবি বানচন্দ্র তর্কালঙ্কারের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কৈবল্যদায়িনী কালীনামে চৈতন্য ✓ লাভ করেন। ইহার পর হইতেই তিনি কালীপূজা ও কীর্ত্তনে এত-দূর মত্ত থাকেন যে একটির পর আর একটি সম্পত্তি ক্রমশঃ হস্ত-চ্যুত হইতে থাকে। কথিত আছে যে এক একটী তালুক যাইত আর তিনি মাকে যোড়শোপচারে ভোগ দিয়া পূজা দিতেন ও বলি-তেন, মা! “একটা বন্ধন গেল।”

মির্‌জা সাহেব হিন্দু সম্প্রদায়ের কালীনামে মত্ত ছিলেন বলিয়া ঢাকা নগরের মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং যাহাতে তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মতে চলেন তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পান, কিন্তু মির্‌জা সাহেব কুলে মানে ও অবস্থায় সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপান্বিত ব্যক্তি, কাজেই কেহই তাঁহাকে প্রকাশ্যে কালীনাম পরিত্যাগ করিয়া ‘তৌবা’

করিতে বলিবার সাহস পান নাই। অবশেষে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া মক্কা সরিফ হইতে চারিজন মোমিন অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা অনিয়া মিরজা সাহেবকে 'দীনে' অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মের রীতিমত রোজা নমাজে আনয়ন করিবার চেষ্টা পান এবং পাথেয় পাঠাইয়া চারিজন মোমিন আনা হয়। তাঁহাদের সহ পরামর্শ করিয়া একটা হাউলি ভাড়া করা হয় এবং সকলে মিলিয়া মিরজা সাহেবকে একটা পত্র দেন যে, আগামী অমুক তারিখ শুক্রবার আছর নমাজের পূর্ব্বে অমুক হাউলিতে মক্কা হইতে আগত মোমিনগণসহ আছরের নমাজ পড়িয়া বাধিত করিবেন। মিরজা সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই নমাজ করিতে সমবেত হইলেন, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে তথাপি মিরজা সাহেব আসিতেছেন না দেখিয়া সকলে নিরাশ হইয়া নমাজ পড়িতে লাগিলেন এবং মিরজা সাহেব আসিতেছেন না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া হাউলির তোরণ-দ্বারে সমবেত হইতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, যখন মিরজা সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, তখন না আসিবার কোন কারণ দেখি না। যদি আমরা ফিরিয়া যাই ও তিনি আসিয়া ফিরিয়া যান, তবে বড় লজ্জার কথা। শুধু লজ্জা নহে, অন্যায়। এমন সময় একজন পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলে ফিরিয়া আসুন, মিরজা সাহেব মসনদে সুখে বসিয়া রহিয়াছেন ও হাসিতেছেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, আমরা 'আদাব' বাজা-ইতে পারিলাম না, লজ্জিত হইলাম। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—হুজুর কোন্ দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন আমরা ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পাইলাম না, ইত্যাদি। এইসব ভদ্রতাসূচক বাক্য বলাবলি শেষ হওয়ার পর মিরজা সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—বন্ধু-গণ, আমাকে এই হাউলিতে আসিতেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আপ-নাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি ও আসিয়াছি। কোন্ পথ দিয়া কি করিয়া আসিয়াছি ইহার উত্তর পাওয়ার জন্য এত গোল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক। তখন নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকগণ মোমিনদিগকে মির্‌জা সাহেবকে 'দীনে' ফিরিতে ও উপদেশ দিতে অনুরোধ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। তখন একজন মোমিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনারা মির্‌জা সাহেবকে যাহা বুঝাই-বার জন্য আমাদিগকে আনাইয়াছিলেন, মির্‌জা সাহেব ইহার খাসা জবাব দিয়াছেন"। কেহ কেহ অধীরতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলি-লেন,—আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মির্‌জা সাহেব হাসিতে লাগিলেন। তখন একজন মোমিন দাঁড়াইয়া বলিলেন,—যেমন গমনশীল লোকের যেস্থানে পৌঁছিবে বলিয়া লক্ষ্য আছে সেইস্থানে পৌঁছিলেই তাহার যাত্রা সফল হইল, সেস্থানে পৌঁছিবার রাস্তা সোজা হউক আর বক্রই হউক তাহার বিচার অনাবশ্যক। সৃষ্টিকর্ত্তা এক। তাঁহাকে যে ভাষায় যে মন্ত্রেই হউক ভক্তিযোগে উপাসনা করিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায়। মির্‌জা সাহেবের কালী নামেই আল্লাবোধ হইয়াছে। ইহাই তাঁহার খোদার নিকট পৌঁছিবার রাস্তা; আপনারা আর কি বুঝিতে চান? সকলেই ইহার পর যার যার স্থানে প্রস্থান করিলেন। মির্‌জা সাহেব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর আরও অনেক গল্প আছে। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি একজন ভেদ-বুদ্ধিশূন্য উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি একাধারে যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ, অথচ ভাবুক কবি। তাঁহার সঙ্গীতগুলি উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ, কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবদুষ্ট নহে। ইহা মাতৃভক্ত সাধকের সরল প্রাণের সরল কথা; ভাষার ঝঙ্কার নাই, বাক্যচ্ছটা নাই, তবু অতি মনোরম। কোন কোন গান এত উচ্চাঙ্গের যে, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, অবশেষে প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। প্রচলিত সঙ্গীতগুলি হইতে মাত্র দুইটি সংগৃহীত সঙ্গীত নিম্নে প্রদান করা গেল। ইহা হইতেই সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে মির্‌জা সাহেব কিরূপ উচ্চস্তরের লোক ছিলেন;—

(১)

সকলই করিতে পার কালী।
এ গো মা সকলই করিতে পার কালী॥
ত্বং কালী করালী বনমালী।
কখন রত্ন সিংহাসন, কখন পাঠাও বন
কখন বৃন্দাবনে বনমালী—
মাগো সময়ে শঙ্কটভয়, তুমি বিনে কেহ নয়
তার সাক্ষী মির্জ্জা হোসেন আলী—
মাগো কালী বলে দিচ্ছি করতালি।

(২)

শমন তোমারে কি ডরি
আমার গুরু আছে যার কাণ্ডারী
কর' না মন জাগা জুরি
সামনে আছে জজ-কাছারী
আইনের মত রসিদ দিব
জামিন দিব ত্রিপুরারী।
কহে মির্জ্জা হোসেন আলী
যা কর মা জয় কালী
পুণ্যেতে মোর শূন্য দিয়ে
পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

ধন্য মির্‌জা সাহেব, ধন্য তুমি! তোমার নিকট যশ ও নিন্দা সকলই তুল্য। ইহ-জীবনেই তুমি সাধনবলে যশ ও অযশ, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এবং পাপ ও পুণ্যের অতীত হইয়াছিলে। হে নিষ্কাম যোগিন্, আবার বলি তুমি ধন্য; যখন তুমি মাতৃমন্দিরে পূজানিরত ও ধ্যান-

মগ্ন অবস্থায় "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" ভাবিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে, যখন কল্পনায়ও তোমার সেই পূত চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয়, তখন ব্রাহ্মণত্বের তুচ্ছ অভিমান ভুলিয়া, তোমার চরণোদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

আমার কথা

আমি ভেবেছিলাম আমার যৌবন গেল, কিন্তু দেখি, সে যে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। আর যেন চল্‌তে পারে না, পা যেন আর সরে না। তা সর্‌বে কেমন করে বল? ধড়ে প্রাণ থাক্‌লে ত? সে যে মরিয়া হয়ে গেছে। তার সঙ্গী চোর এগিয়ে গিয়েছিল, পেছুন ফিরে, যৌবনের দশা দেখে, থতমত খেয়ে গেল। সে এক পা এগ'য়, এক পা পেছু'য় কি করে! কেন? কেবল কি তোমরাই চুরি করতে জান? আমরা জানিনে? তোমরা না হয় বরাবরকার চোর, চোরের সাক্ষী চোর, পরের মর্‌জি যোগাতে চুরি কর। আমরা না হয় কালে ভদ্রে এক আধ দিন, আপনার প্রাণের দায়ে চুরি করি, না করে আমাদের চারা নাই বলে।

যদি তেমন তেমন, নয়ন-লোভন প্রাণ-গলান-গোছ কিছু হয়, আর সে ডেমাক করে ফিরেও না চায়, বরং আরো পালিয়ে যাবার ভয় দেখায়, তখন জান্ না নিলে কি আর জান্ থাকে বল! তবে আমাদের চুরির বাহাদুরী এইটুকু যে বেজাহান্ করে দিয়েও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখি। দয়া কত! এখন যৌবন জব্দ, আর যাবে কোথায়? এস তবে পথে এস, রাখ তবে বড়াই রাখ, ধর আমার পায়ে ধর। কি অম্‌নি অম্‌নি যাওয়া? যৌবন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ল, হার মেনে হাত বাড়ায়ে দিল, বস্, আমার বশ হয়ে রইল। এখন আমার যৌবনের প্রাণ। তোমরা জান লুটপাট্, তোমরা জান লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন! চুরির কায়দা-কানুন কিছু জান কি? চুরি কর্‌ব, চোর বলে ধরা দিব, উল্টা আবার যার চুরি করি তারি দণ্ডবিধান কর্‌ব, তবে ত' বলি চুরি। লাভ,—নিতে এসে, দিয়ে বাঁচে। আর তুমি দাগা চোর! তুমি কি চুরি কর্‌তে পেরেছ, শুনি। সারা জীবনটা চুরিতে কাটাও, আর চুরির হালচাল শেখ না? চুরি

করতে এসেছিলে, চুরি করে চলে যাচ্ছ! কিন্তু চুরির উপর যে চুরি হয়ে গেল, চোরের উপর যে বাটপাড়ি, তার খবর কিছু রাখ কি? আচ্ছা, সব ত নিয়েছ, আমার স্বভাব নিতে পেয়েছ কি? হে ভীরু চোর! সেখানে যে প্রেমময়ের প্রেম ছিল খাড়া পাহারা, কি দিনে কি রাতে। তুমি নিরীহ চোর! তুমি পারবে তার সঙ্গে পাল্টা দিয়ে? তার মত জবরদস্ত, তার মত ধূর্ত্ত, তার মত ছল, তার মত কৌশল, তার মত দুষ্ট হ'তে, তার মত মিষ্ট হ'তে তোমরা জানবে? তুমি আজন্মের চোর। চুরি ত শেখনি? দেখে চোর, ঠেকে চোর, সেয়ানা চোর। তুমি পারবে তার চোখে ধূলা দিতে? যারা এই প্রেমকে মানে না, পাহারা রাখে না, তাদেরই স্বভাব নিয়ে তোমরা পালাও। তারাই তখন স্বভাব হারিয়ে হাতড়ে মরে। আর তা না কর ত, শক্ত ঘা দিয়ে তা ফুট করে, কাটিয়ে তা চৌচির করে নষ্ট করে রেখে যাও। তখন তাদের নষ্ট স্বভাবে কিছু ধরাতে না পেরে অবুঝের মত আঠা দিয়ে তা যোড়া লাগাতে যায়। তাতে যোড় ত লাগে না-ই, আরো লেঠা বাড়ায়। না যায় সে আঠা ধুলে, না যায় তা মললে।

তখন কেবল মন খারাপি সার। পাহারার ভয়ে হে নামজাদা চোর! আমার স্বভাব সামলাতে তোমার সাহসে কুলায় নি। আর দেখ, চেয়ে দেখ, আমার স্বভাব তোমার কি সামলেছে। আমি এখনও সে মুখপানে চেয়ে শিশুর মতই হক্-না-হক্ হাসতে পারি, আমার স্বভাবে তা দেয়। তেমন বাদলা রাতে, বাহিরে যখন বড় ঝড়ঝাপ্টা বয়, আমি অজ্ঞান অপোগণ্ডের মত, সে বুকে মাথা রেখে, নিশ্চিন্ত মনে আজও ঘুমই, সে কেমন করে? হে মূর্খ চোর! তুমি শৈশব নিয়েছ, তার নিছনি, এসব নিতে পেরেছ কি? আমি সে পায়ের আভট্ পেলে, এখনও অঞ্চল মাটিতে লোটায়ে চঞ্চল হয়ে ছুটে যাই। যে বাচালতা আমার তখন, যার তার কাছে, যা খুসী তা বলাতো, এখন না হয় সে, যার কথা তার কাছে যেমন করে খুসী বলায়, তফাৎটা

কি ? তুমি বাল্য বেঁধেছ, তার এই অসাবধানী, সহজ সুন্দর বিভ্রম বাঁধিতে পেরেছ কি ? দেখ আমি যেই মুগ্ধা সেই মুগ্ধা ! কৈশোরে মুগ্ধা ছিলাম তারে না জেনে, এখন মুগ্ধা হয়েছি তারে জেনে। মধু-মাখা বুলি আমার ছিল যে তখন, এখন কি বুলি মধুমাখা নয় বলতে চাও ? তারপর যৌবনের তাজা প্রাণ, তার যা কিছু তারিফের সবই আমার স্বভাবে মজুত দেখছ না কি ? তুমি তবে নিলে কি ? মরণেরে দিলে কি ? তোমার ও পুঁটুলীতে বাঁধা শুধু কটি নামকরা জিনিস, তাদের সার পদার্থ কিছু আছে কি ? ভয় পেও না, আমি তোমার ও ফাঁকির মালে নজর দিব না। তুমি যাবার কালে সচ্ছন্দে তা নিয়ে যেও।

আমার পঞ্চ সেবাইত তাকে তাকে ছিল, কেমন করে চুরি ধরা যায়, কি করে চোর পাক্‌ড়াও হয় ! এখন কাবু দেখে, তারা সবাই মিলে এসে এ'কে ঘিরে দাঁড়াল। তখন তার মাথা নীচু করায়ে, তার নাকে খৎ দেওয়ায়ে, আপনাদের মনের ঝাল মিটালো। চোর নিঃশব্দে সব সহিল। আজ এঘরে যৌবন বাঁধা, চোর আটক। আর তাদের চালনে চলন, তাদের খেয়াল মাফিক কাজ নয়। আজ আমি চালক। রাশ আমার হাতে। হুকুমে চালাব, তেরিয়া হবে ত পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে দিব। পালানো কি মুখের কথা !

তোমরা সাবধানী গৃহস্থেরা, কেবল ঘর ঘর করে মর। ঘর সাম্‌-লাতে জান কি ? এই যে চুরির ভয়ে তোমরা ঘরের বা'র হওনা, কিন্তু চোর তবুও ত জবরদস্তি করে ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে পালায় ! তখন না পার তোমরা চোর ধর্‌তে, না জান তোমরা চুরির মাল ফিরিয়ে আন্‌তে। তোমাদের গেল ত, গেলই গেল, তোমাদের হারাল ত, হারালই হারাল। তখন হাতপা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বস, না ত সিধা পথে খুঁজে মর। তোমাদের মুখ দেখ্‌লে আমার মায়া হয়। বলি সিধা পথে কি চোর ধরা পড়ে, না চোর চলে ? সাধে কি আর আমি সিধা পথ সোজা পথ ছেড়ে, এই বাঁকা পথ, বেপথ,

কাঁটার পথ ধরেছি ? কাঁটা কি আর গায়ে ফোটেনা ? কিন্তু বিঁধে বেদনা জাগাতে না জাগাতে, আপন হাতে সে কাঁটা তুলে ফেলে দেয়, সে আমার দরদের দরদী। তাই আমি দুঃখু পেয়েও দুঃখের বাড়ী জানিনা, জ্বালার মধ্যে থেকেও জ্বলনিতে পুড়ি না, আমি কান্না-কাটার ধার ধারি না। আমার দিল্ খোস্, আমার মেজাজ সরিফ। যতদিন, এই যৌবনের প্রাণ লয়ে, আমার প্রেম বেঁচে থাক্‌বে, আমার স্বভাবে এম্‌নি সব বজায় রবে, ততদিন আমি কার পরোয়া করি ? আমাকে পায় কে ?

"শুন শুন ওহে ঘর-ভাঙ্গনের, ঘর-ভাঙ্গানির দল! এবারে বেড়ী পায়ে বসে দেখ, আমার ভাঙ্গা ঘর দুরস্ত হয় কি না হয়। তোমাদের নিঠুর কঠোর পীড়নে এর গায়ের যত কিছু দাগ, যত কিছু ছাপ, বেমালুম করা যায় কি না যায়। ওগো কাঁচা কারিগর! তোমাদের কাঁচা হাতের তুলির বেথাপ্পা পোঁছ শুধ্‌রে নিতে পারে কি না পারে। এবারে মহাশক্তিধর আমার সব বুঝে শুনে আপনার হাতে নিয়েছে। পরক কর বসে, আমার সেদিন গেছে, না আছে ? বিচার কর দেখে, আমার লাভ কি লোকসান হয়েছে ? সত্যি করে বল, আমার মরণ ঘনা'য়ে এসেছে, কি আমার বাঁচন দেখে তাকে দূরে যেতে হয়েছে ?

আমার ঘরে আজ মণিমাণিক্যের আলো জ্বলছে! এ আলো নিব্‌বার নয়, নিঃশেষ হবার নয়, এক ভয় চুরির। লাবণ্যের ছটা, বাহিরের আলো, বাইরে থেকে বাহিরকে আলোকিত করেছিল। আর এ প্রেম-জ্যোতিঃ ভিতর থেকে সব দাগ ছাপ ভেদ করে, সব স্বচ্ছ করে দিয়ে, বাহিরে এসে প্রকাশিত হ'ল। দেখ আমার চোখে মুখে সে জ্যোতিঃ ঠিক্‌রে পড়ছে কি না ? তবে তোমার লাবণ্য সম্বরে,' হে যৌবন! আমার লোকসান কি করলে ? আমার তবে সে দিন গেল কৈ ? আমার ঘরে ভাঙ্গনি ধরেছিল। তোমার প্রাণ পেয়ে, দেখ চেয়ে দেখ, কি কারিগরি ফলায়েছে আমার সে

প্রেম-কাস্তিগার। এবারে শুধু বাহিরে তাক্ লাগানো নয়। দেখ দেখ, ভিতরকার শোভন সাজ দেখ, শোভা দেখ, দেখ কি হ'তে কি হল, নজর করে দেখ। আরো কি ভাঙ্গবার মতলব রাখ? হে বয়শ্চোর! তুমি তোমার সাথী জুয়াচোর, জীর্ণ শীর্ণ জরাকে সন্তর্পণে এ পুরীতে ঢুকে, অলক্ষিতে বসে বসে ঘরের বাঁধন ঢিলা করতে হুকুম দিয়েছিলে। বাঁধন খুলে গেলে, ঘর অমজবুত হলে, শেষকালে আপনি ভূমিসাৎ হবে ব'লে। ঢুক্‌বার মুখে আমার আনন্দের হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ মূরতি দেখে তাকে ভয়ে ভাগ্‌তে হ'ল ত? এখন যে লজ্জায় তুমি মুখ নীচু করলে কি হবে ভাই। অতঃপর তোমাদের তুলির এসব কাঁচা লিখন, সুধ্‌রে নিতে তার পাকা হাতের লাগে কতক্ষণ! এখন তবে তুমি ঘরে থাক্‌লে, বয়েস না যেতে পেলে, চুরির মাল মরণেরি পায়ে নিয়ে বুঝিয়ে না দিলে, মরণ কি আমায় খামাখাই এসে তলব করবে? তার কি আর নিজের কিছু ভাববার অবসর আছে? তাকে ফাঁকি দিয়ে, তাই ফাঁকতালে বেঁচে নিতে হয়, ছলে কৌশলে তোমাদের ধরে বেঁধে রাখ্‌তে হয়। তাকি জানে সকলে, তাকি পারে সকলে, প্রেম না হলে?

আমার পঞ্চ সর্দ্দার দেখ্‌ল চোর ত ধরা, পড়েছে কিন্তু ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবার মতও ওদের কিছু নেই। সে যে, ওদের সব নষ্ট করে দিয়ে গেছ্‌ল, চুরি করে ত নেয় নি। তা কি জানি ওরা কেমন করে, কার কাছ থেকে কি যোগাড় করে, আপনার আপনার কাজ বেশ চালিয়ে নিচ্ছে। হাতপা গুটিয়ে বসে থাকে নাই। আমিই বা তা থাকতে দিব কেন? খাটতে এসেছে, খাটিয়ে নেব ত? শব্দের স্বরের বেশ একটু মাধুর্য্য টের পাচ্ছি, তাকে ঠিক মধুমাখা না বলতে চাও, কিন্তু তাতে ক'রে প্রাণ-গলানো কাজ বেশ চলে। পরশের ভাঙ্গা পাত্র গলিয়ে, সব মোহ পড়্‌তে পায়নি, সময়ে নাকি ধরা পড়েছিল, পাত্র মেরামত হ'ল। রূপের

চোখের নীল কাঁচ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, তার রঙ্গীণ দেখার নেশা টুটাবে ব'লে। এখন খালি চোখে দেখা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, সত্যিকার রঙ্ দেখ্‌তে পেয়ে তার সব ভুল ভ্রান্তি ঘুচে গেছে। যাক্ ভালই হয়েছে। অমঙ্গল করতে গিয়ে তার মঙ্গলই হয়ে গেল। রসের ভেজাল সব সে আপনা হাতে ছেঁকে নিয়েছে। ঠিক তেমনটি না হলেও মেশাল কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে না। গন্ধের আমুদে স্বভাব, সে কি পারে তার খাতির খতম হবে বলে, আমোদ না ক'রে থাক্‌তে! তবে তার আমোদে এসে কেউ যোগ দেয় কি না দেয়, আমি ভাই তা বল্‌তে পার্‌লাম না।

সবই ত আমার মনোমত হল, এক পারি না এই আমার "আমি"র সঙ্গে। দিনকের দিন সে যেন আরো গোঁয়ার গোবিন্দ গোছ হয়ে পড়্‌ছে। আমার যেজন চিরবাঞ্ছিত, আমি মনে প্রাণে যার মন তুষিতে চাই, কৈ সে ত ভুলেও একবার ভাবেনা আমি শুভ্র কি কালো, একবার বিচার করেনা আমি মন্দ কি ভালো! কিন্তু যারে আমি মোটেই মান্‌তে চাই না, তার অত আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা কেন বল ত? আমাকে শুভ্র দেখবার, আমাকে ভালো করবার দিকে ওর অত ঝোঁক কেন? বাপরে! কি কড়া শাসন! শাসনের চোটে যে আমি অস্থির। যদি সময় বুঝে, মনে রেখে চল্‌তে না জানতাম, তা হলেই হয়েছিল আর কি? দুই মাথা-ভাঙ্গায় মিলে কোন্ দিন একটা খুনখরাপি হয়ে যেত। অভিমান কোন্ দিকে সাক্ষী দিত তা ত বুঝ্‌তেই পার। আজকাল তাতে এতে যা গলাগলি ভাব! একজন আর একজনকে যেন চোখ থেকে হারায়। যদি নিত্যকার এসব অন্তঃপুরের বিবাদ, বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহের কথা বল্‌তে যাই, তাহলে বুঝতে পার আমাদের কেরামত কতদূর। কে বলে আমরা অবলা দুর্ব্বলা? বীর নারী আমরা, বীরদর্প-হারিণী আমরা! আমাদের এক তর্জ্জনীর তর্জ্জনে জীবলোক থরহরি কম্পমান। আমাদের এক নয়ন-পাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীরপুত্র

সকলকে দূরে দাঁড় করে রাখি। আবার যদি মনে লয় ত আর এক চাহনিতে তাদের আমাদের আসনার্দ্ধে এসে বস্তে অনুমতি করি। তখন তারা তা ভাগ্য ব'লে মেনে নেয় কি না নেয়? আমাদের সঙ্গে চালাকি? সে কাপুরুষেরা যখন আসে আমাদের জাত তুলে গাল দিতে, তখন তাদের আস্পর্দ্ধা দেখে কি আর দু'কথা না শুনিয়ে পারি? তবে যে আমাদেরও মাঝে মাঝে, মাথা নীচু, কাঁচুমাচু করতে দেখ, সে কেবল যাদের বড় বড়াই, যাদের বড় চাই তাদের দিকে যে ছাই, সমানে চাইতে পারিনে তাইতে? এই দেখনা, আমি যতই এই "আমি"র ভয়ে তার মন যুগিয়ে, তার চোখ বাঁচিয়ে চল্‌ছি, ততই সে আমায় যেন পেয়ে বস্‌ছে। এখন দেখ্‌ছি, হামেসাই আমাকে "আমি"তে পায় আর অভিমানও সঙ্গে এসে ঘাড়ে চাপে। তখন যা বিতিকিচ্ছা কাণ্ড হয় তা আর কহতব্য নয়। আমি আর তখন মানুষ থাকি না। না থাকে তখন কোন বুদ্ধি বিবেচনা, না থাকে কোন লজ্জা সরম, না মান সম্মানের ধার ধারি। কি করতে যে কি করি, কি বল্‌তে যে কি বলি; যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। যারে এক মুহূর্ত্ত চোখছাড়া করতে চাই না, সে হয় ত এসে দাঁড়িয়েই আছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। যার মুখের কথার আমি কাঙ্গাল, হয় ত সে কত অনুনয়, কত বিনয় করছে কানেও তুলি না। ক্ষণে চক্ষের জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, ক্ষণে মুখে হাসির রেখা দেখা দিচ্ছে। আবার কার জানি অপমান কিসের জানি অপমান, আর সহ্য করতে না পেরে একেবারে ভূমেই গড়াগড়ি। দাঁড়িয়ে এসব ভৌতিক ব্যাপার দেখে, প্রাণভরে এক কৌতুক রস সম্ভোগ করে, নিমেষে ওঝার রূপ ধরে, মন্ত্র ঝেড়ে ভূত ভাগিয়ে দেয় বহুরূপী মায়িক সে আমার। তখন আর কি মুখ দেখাতে পারি? না কি চোখ তুলে চাইতে সাহসে কুলায়! লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাই, সরম রাখি কোথায়? অনুতাপ তখন তুষের আগুন জেলে আমায় অঙ্গার করে ছাড়ে। তা দেখে আর এক মন্ত্রবলে,

সে অঙ্গারকে সংস্কারশুদ্ধ উজ্জ্বল মাণিক করে, বুকের মাদুলী করে, গলে পরে' থাকে, সে আমার সব মাণিকের মাণিক। তখন সে হৃদ-পরশে, জড়ে চিৎশক্তি এসে তাকে মানুষ করে তোলে! চমকে চেয়ে দেখি আমি তার কণ্ঠলগ্না। এখন দেখ্ছি আমার কিছুই ফ্যাল্না নয়। আমায় ভূতে না পেলে, তাপে না পোড়ালে, অঙ্গার কি হ'তাম? অঙ্গার না হলে মাণিক ব'লে তার গলে কি দুল্তাম? সে গলায় না দুল্লে, সে হৃদ-পরশ না পেলে কি আর মানুষ হতাম? কেগো তুমি! একাধারে দৈত্যরূপে, দেবরূপে আমার মরণ ঘটায়ে আমার বাঁচন দেখাচ্ছ? এমন করেই কি আমায় মরণে মেরে, আমার বাঁচন দেখিয়ে, আমার মরণের ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছ? আমি বুঝে নিয়েছি, আমি দেখে নিয়েছি, সত্যি মরণ আমার হতে পারে না, তুমি তা হতে দিবেনা। আমি বড় খাতির জমা, আমার মন বড় নিশ্চিন্ত। হে দাতা ঠাকুর! দিয়ে দিয়ে কি আর তোমার আশ মেটেনা? আমার একলা প্রাণে এত কি ধর্বে? উপ্চে পড়্বে যে। তাই বুঝি হে প্রাণ-প্রতিম! আমার প্রাণের প্রতিরূপ ধরে, ছলে আপনাতে কিছু ধরায়ে সব ধরাতে এসেছ? "আমি ত বুঝি না কি লাগি তোমার বিলাস হেন?" যদি আমায় চিরজীবী করেছ, তবে আর এক বর মাগ্তে হ'ল, আমার চিরসঙ্গী হয়ে থাক্তে হবে। শুধু তুমি আমার প্রাণ-প্রতিম হলে চল্বেনা, আমাকেও তোমার প্রাণ-প্রতিম হওয়াতে হবে। তবেই না সব মিশ খাবে, সব টেঁক-সই হবে।

আমাতে এখন সব এঁটেছে। আমার যৌবন আছে, আমার বয়েস রয়েছে, আমার ভূতগণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। আমাতে "আমি" আছে, আমাতে অভিমান স্থান পেয়েছে, আমাতে আনন্দ ধরেছে। কিন্তু কি জ্বালা! এত "আছে" "আছে"র মধ্যে প্রাণ যেন কেমন আই-ঢাই করে, ঘেঁসাঘেঁসিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে! তারি জন্যে কিছু "নাই, নাই" চাই, কিছু "যাই যাই" থাকা লাগে। নয় ত,

মহাস্ফূর্তি, বড়তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি এরা যে সব রাক্ষসীর জাত! এদের দিয়ে কি কিছুর বিশ্বাস আছে? কখন যে কি গ্রাস করে ফেলে তার ঠিক কি?

আমি এসেছিলাম, বসন্তের এক অফুটন্ত পাখী পরভৃতের কুলায়ে। তার পক্ষপুটের তলায়, তাপ দিয়ে আমায় ফোটাবে ব'লে। সে তাপ পেয়েছে, সে ফুটে উঠেছে। সে জেনে নিয়েছে, কেন তার এবাসায় আসা, কেন তার এবাসায় বাসা, এখন পাখী বুঝিবা বিমানে ওড়ে? দূরে সে ডাক শুনেছে, সে আপন ডাক, সে মিঠা ডাক, সে কুহু ডাক। আর কি তার পরবাসে মন টেঁকে? কালাচাঁদ বাঁশরীতে তান ধর্‌লে পরে, আর কি রাধা ঘরে রইতে পারে?

যৌবন! আমি না বুঝে তোমায় বন্দী করে রেখেছিলাম। হে দীন চোর! খামাখা তুমি আমার ঘরে আট্‌ক আছ। এবারে যাও, তোমরা যার দাস তার কাছে চলে যাও। আমিও যার দাসী তার কাছে যাই। আর তোমাদের ধরে রাখা নয়। এতদিন তোমরা যেতে পাগল হয়েছিলে, এখন আমি যেতে পাগল হয়েছি। গেলে পরে, তোমরাও আর এমুখো হবে না, আমিও আর এমুখো হব না। তোমাদের সঙ্গে চিরবিদায়, জন্মজন্মের বিদায়। আমায় উন্মনা দেখে, আমাকে শাসনের বা'র দেখে, আমার "আমি", আমার অভিমান, আপনাথেকেই আমায় রেহাই দিয়েছে। তারা আর আমার মুখদর্শন কর্‌বে না বলে, একেবারে এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা এখন তবে কি কর্‌বে? আমি এক দুরন্ত অভিসারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করব, সঙ্গে কারোকে যেতে নাই। ওরা যাবে ওদের প্রভুর কাছে, মরণের কাছে, তোমরা যাবে কোন্ চুলয়? তোমরা আমাকে ছাড়া জান না? তোমরা আমার সঙ্গে যাবে? অভিসারে কি কেউ সঙ্গে যায় রে পাগল! আমি যে সব ছেড়ে, নিঃস্ব, নিরাভরণা, নিরাবরণা হ'য়ে, ঘোর রাতে, আমার সে লজ্জা-নিবারণের কাছে যাব, আঁধারে মিশে মিশে! এ ঘরের

কিছুই সঙ্গে নেব না, নিতে পারি না। তোমারা এ ঘরের নও? তোমরা আমার সঙ্গে এসেছিলে, আমার সঙ্গেই যাবে? আস্‌বার বেলাও তোমাদের আমি চোখে দেখ্‌তে পাই নাই, এখনও পাব না? তোমরা আমার চক্ষুর অগোচর হয়ে থাক্‌বে? চল তবে চল। জানি তোমরা ছাড়া আমি কাণা, আমি কালা, আমি খোঁড়া, আমি বেবশ। আমার তা'হলে যাওয়াই হয় না, আগে সেকথা ভাবি নাই। যদি ভগবান্‌ করেন, যদি আমার অভিসারের যাত্রা সফল হয়, যদি সে মিলন ঘটে, তবে তোমাদেরও গতি হবে? চল তবে চল, আর দেরী নয়। অনেক রাত হয়েছে, সবই নিঝুম! এই সকলকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার সময়, আজ অমাবস্যা নিশি! বাইরে ঘন ঘটা! উঃ বাচ্‌লাম। নয় ত সে লম্পট্‌, সে নিশাকর, সে নেশাকর, আকাশে থাকলে আর আজ আমার রক্ষা থাক্‌ত না। একবার উঁকি মেরে আমায় দেখ্‌তে পেলে, নষ্টামি করে আমার সঙ্গ নিত। আমার প্রিয় সমাগমে বাদ সাধ্‌ত। তখন আমার কলঙ্কের বোঝা বাড়ায়ে আমাকে এপথ থেকে ফিরে যেতে হ'ত। ঘন ঘটাই আজ আমি চাইছিলাম: আমার সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন তাই ঘটিয়েছেন। কত ভাবনা তার আমার জন্য। তা বলে এ গুরু গুরু গরজন কেন? এখানেও শাসনের কথা শুন্‌তে হবে? এখানেও গুরুজন?

গুরু গুরু গরজন? হে মুখর মেঘ! তোমার পুরুষের প্রাণ, তুমি অভিসারের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? তাই অসময়ে এসেছ ডাক্‌হাঁক্‌ করে আমায় ভয় দেখায়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিতে? আমি যে ঘরের বা'র হয়ে, ভয়েরও বা'র হয়ে গেছি? তুমি মনেও করোনা, আমার এই দুরু দুরু হিয়া, তোমার ও গুরু গুরু গরজনে? ঐ দেখ্‌ছনা কি, করুণ নারীহৃদয়, অভিসারের লাঞ্ছনার নিস্তারিণী, দ্যুতিধারিণী, দূতী দামিনী কেমন হেসে হেসে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, শুভ-মিলন ঘটাতে! তবে হে চঞ্চল-প্রভ! আবার চমকাও ত! আমি যে এখনও আমার সঙ্কেত স্থানের সন্ধান পাই নি। একবার সে স্থান

দেখায়ে, তোমার ত্বরিত গতিতে আমায় তথায় পৌঁছায়ে দাও ত! আমার যে আর তর সয়না। ও কি দেখালে? ও যে শ্মশান ভূমি! ঐ কি আমার সঙ্কেত স্থান? ঐ কি আমার মিলন মন্দির? প্রিয়-তম কি সেইখানে আমার প্রতীক্ষায় আছেন? শব্দ! চুপ্, এখন সে ডাক শুনিও না; পরশ! তোমার পায়ে পড়ি সে ছোঁওয়া এখন লাগিও না; রূপ! ওরূপ এখন দেখিও না। এখনও যে পথ বাকী, এখনও যে পায়ে চল্‌তে হবে। গন্ধ! অমন করে ছুটোনা। তোমার আভাস গেলে, আমার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠায় উতলা প্রাণ যে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে আমায় পেতে ছুট্ দিবে। তখন এ আঁধারে, তারে খুঁজে পাব কেমনে? ওকি! বাতাসে ও কার সুবাস? শূন্যে কার মধুমাখা ডাক্? দিকে দিকে কার মোহন রূপ? পথ ফুরিয়েছে কি? গায়ে ও কার পরশ? আর দূরে নও?

"বিনিশ্চেতুং শক্যেন সুখমিতি, বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রাবা কিমুবিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে-স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

বিকার আর চৈতন্য! চৈতন্য আবার বিকার! শ্যাম আর রাধা, রাধা আর শ্যাম! না না, আধা শ্যাম, আধা রাধা! না না, শুধু শ্যাম! না না, শুধু রাধা! একে, একে দুই নয়। যুগল-মিলন নয়। আমি রাধা, তিনি রাধা! আমি শ্যাম, তিনি শ্যাম। আধায় আধায় পূর্ণ মিলন, মহামিলন! যুগযুগান্তের মিলন!

কলঙ্কিনী রাধা ঘরের বা'র হয়েছে, সে মরেছে। সকলে মিলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তার চিহ্নও রাখবে না বলে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছে আর, তার অন্তরঙ্গের। চোখের জল পুঁছ্‌ছে। এখন আগুন নিবেছে, রাধাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে

তারা সবাই ম্লানমুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারা এ মিলন, এ বিচিত্র বিলাস-যাত্রা দেখ্‌ল না, তারা চোখ তুলে চাইল না, তারা ভক্তি-ভাবে দেবতাকে প্রণাম কর্‌ল না। কেমন করে কর্‌বে? তারা কলঙ্কিণী রাধার, কৃষ্ণ-কান্তমণি পরশমণিকে চিন্‌বে কেমনে? কলঙ্কে কালো না হ'য়ে ভাল থেকে, কে কবে তাকে চিন্‌তে পেরেছে? তোমরাই এখন বল তোমাদেরই জন্ম সার্থক, কি আমারই জন্ম সার্থক?

শ্রীজগদম্বা দেবী।

মরণে জয়।

[কথা নাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেছে...পূর্ণিমার চন্দ্র পরিপূর্ণ তরল জ্যোৎস্নাধারা ঢালিতেছে...শোভনা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, তাঁহার কুন্তল আলুলায়িত...বাতাসে তরঙ্গ তুলিয়া কুন্তল দুলাইতেছে...জ্যোৎস্নার ধারা তাঁহার মুখ চোখ প্লাবিত করিয়া দিতেছে, চূর্ণ কুন্তলের উপর আলোক ও ছায়ার খেলা চলিতেছে...বাতাসে আম্রমুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে...জানালার নিম্নে বাগান—বাগানে নানাবিধ ফুলের গাছ, বেল যূঁই মল্লিকার সারি, মল্লিকার উপর চাঁদের আলোর হাসি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একপার্শ্বে কতকগুলা শুষ্ক পত্র ও আবর্জ্জনা-রাশি জ্বলিয়া ভস্ম হইতেছে..সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছিল, এখনও অগ্নি নিভে নাই; সেই বহ্নি একটু একটু করিয়া কি রকমে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা সুন্দর মুকুলবেষ্টিত গোলাপ-বৃক্ষকে গ্রাস করিতে ধাইয়াছে। মাঝে মাঝে বাতাসে সেই ঘাস-পোড়ার তীব্র গন্ধ ভাসিয়া উঠিতেছে। দূরে—পথিপার্শ্বস্থিত সৌধরাজি...তাহার মধ্যে উচ্চ-চূড়ার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। শোভনা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একাকিনী সব দেখিতেছিলেন...অকস্মাৎ চঞ্চল ভাবে...]

শোভনা। মালি! মালি! আঃ অমন সুন্দর গোলাপ গাছটা আগুনে পুড়ে গেল, তোদের ও জঙ্গল পোড়াবার কি দরকার ছিল—যাঃ...না শুখ্‌নো পাতা জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে আমার অমন

সাধের গোলাপ গাছে আগুন লাগ্‌ল...এখন'ত আগুন নিভান যেতে পারে, মালি! মালি! সব পুড়ে গেল...যাঃ—

[শোভনা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহিরের দিকে যাইতে গেলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী রমেন্দ্র মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে দ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রমেন্দ্র। দাঁড়াও...সবুর ..যাক্ পুড়ে, তুমি নেকলেশটা খুলে দাও .. দাও...গোলাপ পুড়্‌ছে ত তোমার কি, ফুলের সঙ্গে ভাব করতে হয় এর পর ক'র। দাও, দাও, আঙুর তা না হলে মদ খাবে না...তোমার নেকলেশ ছড়াটা চাই!

[শোভনা প্রস্তর পুত্তলিকাবৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—স্থির দৃষ্টি, আঁখির পাতে পলক পড়িতেছে না—]

রমে। দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও। আঃ বল্‌ছি আঙুর তা না হ'লে মদ খাবে না। হো-হো—দাও, দাও, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব ?

শো। নেকলেশ ছড়াটা যে মা'র...

র। আঃ...তোমার মা ত' চন্নন কাঠের সঙ্গে পুড়ে গন্ধ হয়ে উড়ে গেছে বাবা...ধোঁয়া...ধোঁয়া...ছাই ছাই...দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও, বাজে কথা রেখে দাও—

শো। আমি আর একছড়া নেকলেশ দিচ্ছি বা'র করে...ওটা যে মা'র গলায় ছিল...

র। আঃ—আবার কথা কাটায়...মা'র গলায় ছিল; মা'র গলাও চন্নন-কাঠে পুড়েছে, আছে পড়ে সোনা—তোমার গলাও চন্নন-কাঠে পুড়বে। সোনা কার' গলায় থাকে না, সোনা কার' গলায় থাকে না...দাও...দাও...আঃ...বল্‌ছি...আঙুর তা না হ'লে মদ খাবে না।

শো। তোমার পায়ে পড়্‌ছি—আমি আর একছড়া স্বরস্বতী হার তোমায় এনে দিচ্ছি—তার ত এর চেয়েও দাম বেশী...

র। না—না—বল্‌ছি আঙুর বলেছে—"তুই যে আমায় ভালবাসিস্—

তবে তোর মাগের গলার সেই নেকলেশ ছড়া এনে দে... নইলে মদ খাব না...কিছু খাব না”—দাও, দাও, হুঁ—বলে কি না, আমি আঙুরকে ভালবাসিনি। কল্জে কল্জে হুঁ...

শো। ওটা যে মা'র চিহ্ন...

র। হ্যাঁ, মা কোথায় তার আবার চিহ্ন...চিহ্ন...বলি তুমি আর আমিই কি ভিন্ন...ও তার গলায় থাকাও যা, তোমার গলায় থাকাও তাই .দাও ..দাও...এস দেরী কর না; মদ জুড়িয়ে যাচ্ছে, ঢালা পড়ে রয়েছে...

শো। তোমার পায়ে পড়ি...তোমার পায়ে পড়ি...ও যে মা'র চিহ্ন।

র। তবে রে...দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও (টানাটানি করিতে লাগিল)।

শো। দিচ্ছি...দিচ্ছি...আচ্ছা একটা কথা শোন—দিচ্ছি—(নিশ্বাস ফেলিয়া) তুমি কি আমার স্বামী নও—দিচ্ছি...দিচ্ছি... সবই ত দিচ্ছি—আজ তিন মাস পরে তোমার একবার দেখা পেয়েছি—তুমি যে আজ আমার গলার হার ধরে টেনেছ— এতে আমি নিজেকে—আঃ—কি সুখ, তবু ত তুমি আমায় ছুঁয়েছ, কিন্তু—যেন—তবু ত একবার দেখা পেলুম—হার নাও দিচ্ছি—মা'র গলার হার তাও দিচ্ছি, মা'র, মা'র, মা'র আরো চাও ..নাও...তবু একবার—একবার একটি বার ব'স, তোমায় একবার দেখি...একবার, একবার দেখি।

র। যাও—যাও—ওসব ভাল লাগে না···আমি এখন বস্‌তে পারব না...আঙুর এখনও মদ খায়নি, দাও...

শো। তুমি একটু বস্‌বে না—আচ্ছা তুমি আঙুরকে খুব ভালবাস— (রমেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া) খুব ভালবাস, তাতে আমার কিছু দুঃখ নেই। কিন্তু দিনান্তে একবার করে দেখা দেবে না? বল—তাকে কেন, যাকে ইচ্ছা ভালবাস, একবার করে দেখা দেবে বল—বল...

র। সব শেয়ালের এক রা...প্রথমটাও ওই বলত। সেটা ম'ল গলায় দড়ী দিয়ে। তারপরটা ম'ল ফুল শুঁকে শুঁকে বুক শুখিয়ে গেল। যাও, যাও, ও বাগান পুড়ে যাওয়াই ভাল। আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। হাত ছাড়—আঙুর রাগ করে বসে রয়েছে। আঃ...

শো। আঙুর রাগ করেছে ..আঙুর! আঙুর! বাঃ বেশ নামটী ত—আচ্ছা যাও, না না এস...তুমি যাকে ভালবাস তার নামটিও বেশ!—

র। আঙুর! আঙুর! আমি তোকে ভালবাসিনি—দেখ, দেখ,

(হারছড়াটা দোলাইয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান)

[একটা পাপিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল—শোভনা ধীর স্থিরভাবে দ্বারের পানে চাহিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ফিরিয়া জানালার ধারে গেল—দেখিল আগুন গোলাপগাছকে পুড়াইতেছে, ফুল ও কুঁড়ি পুড়িয়া ঝরিয়া পড়িতেছে...]

শো। সব ছাই করে দিলে বেশ—বেশ ত, শুখন গোলাপের গাছশুদ্ধ ছাই হয়ে গেল...একটা গলা চেপে মরেছে, আর একটা বুক শুখিয়ে, রক্ত শুখিয়ে হাহা করে মরেছে...হাহা হাহা, তাই চারিদিকে সেই হাহা...(গৃহকোণে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহার তৈল অভাবে সলিতা সব পুড়িয়া প্রদীপের বুকের মাঝখানটা জ্বলিয়া উঠিয়া প্রদীপটা নিভিয়া গেল) তোরও সেই হাহা, তোরও বুক পুড়ে গেল...তুইও নিভে গেলি ?

[শোভনা 'মা গো' বলিয়া গৃহতলে আছড়াইয়া পড়িল। দূরে তখন পথ বাহিয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্র ও মধুর স্বরে পথিক গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—]

প্রাণের কথা কইতে পারি বল্‌ব বল ও সই কারে,
পেলে সে রসিক সুজন দরদী তেমন্

প্রাণ খুলে সে বলি তারে।
প্রাণে প্রাণে কইলো কথা তার—
খালি করে ঢেলে দি সই ভরা বুকের ভার
ওলো সে আমার—
ঘুচে লো সকল ব্যথা রেখে মাথা বুকের 'পরে।
অনুরাগে গল্‌বে তারি মন
কাঁটা তুলে বুকে নিয়ে কর্‌বে লো যতন
(ওসে পরশ রতন)
চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে।

[রমেন্দ্রের বৃদ্ধা মাতার প্রবেশ—সর্ব্বদাই মুখে বিরক্তি মাখান...]

র-মা। অ রমাই! রমাই! বৌমা—বৌমা—রমাই এয়েছিল না?

শো। চলে গেছেন।

র-মা। আহা, বাছা এল, আর তখনি চলে গেল? একে ত এদিক মাড়ায় না, তা মানুষকে দুটো ভাল কথা বল্‌তে হয়; তা নয়। একি, তুমি এমন করে পড়ে আছ কেন? আলো নিভিয়ে—অন্ধকারে? তাই বুঝি সে চলে গেল?— বুড়ো বয়সে আর পারিনে; হ্যাঁ, বিয়ে দিয়ে যেন আমারই যত জ্বালা। তিন তিনবার বিয়ে দিলুম গা, সব আঁটকুড়ির ঝি মর্‌তে মরে জ্বালিয়ে গেল! তোমারই ত যত দোষ, না কথা, না মায়া, না শ্রদ্ধা, ...এতে কি আর মানুষের শান্তি হয়। সেও অম্‌নি একেই ওই—না হলে আমার এমন দুর্দ্দশা—আমি বুড়ো মানুষ, আর কতদিকে সাম্‌লাব?

শোভনা। না মা, আমি তাঁকে বস্‌তে বলেছিলুম।

র-মা। 'বস্‌তে বলেছিলুম...বস্‌তে বলেছিলুম'...কেন পুরুষ মানুষ, অমন একটু বা'র দোষ থাকে,' তা তাকে সাম্‌লাতে হয়, না অম্‌নি করে। কে জানে বাপু তোমাদের সবই অনাছিষ্টি। আমরাও

কত সাম্‌লেছি কর্ত্তার আমলে। তাই ত আজ আমার রমাই যা হোক, পাঁচজনের একজন ত বটে!

শো। মা তুমি কেবল আমারি দোষ দেখ।

র-মা। দেখ্‌ব না—দেখ্‌ব না—বটে, কেন আমি কি একচোখী নাকি? ভাল জ্বালা, ভাল বল্‌লে মন্দ হয়। এখন কলির ধর্ম্ম কিনা, লেখা পড়া শিখে সব কারুকে আর দেখ্‌তে পারে না—গ্রাহ্যই নেই। ওমা একটা এল, দিনরাত প্যান প্যান ঘ্যান ঘ্যান, আর বই মুখে করে বসে, শেষ আমার হাতে দড়ী দেবার যোগাড়...একটা এল, কথাই কয় না—কথাই কয় না—শেষ মুখদিয়ে রক্ত তুলে ম'ল।

শো। তারাও গেছে, আমিও গেলে সবাই জুড়ায়। যত দোষ ওই বই মুখে করে থাকা ঠিক্!

র-মা। আবার আমার সঙ্গে চোপ্‌রা? কর্‌বে অন্যায়—ভাল বল্‌লে সব মন্দ হয়। আমি আর ক'দিন? তোমারই ভালর জন্যই বলি,—আমার জন্যে ত কা'কেও বলিনি।

[রাগভরে বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন—শোভনা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

র-মা। (ফিরিয়া আসিয়া) আঃ ভালখাগীর মেয়ে আবার কান্না কিসের? অমন অলক্ষণে কান্না দেখ্‌তে পারিনে। কেন, কি বলাটা হয়েছে? ওঃ কি আমার সুবচনির হাঁস রে, দিনরাতই প্যাঁক প্যাঁক কর্‌ছে—জ্বালাতন—ব্যাটার বিয়ে দিয়ে যেন আমিই চোর!

(রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বৃদ্ধা চলিয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[আঙুরের বাসগৃহ—দেখিতে সুন্দরী...কপালের উপর চুলগুলি থাকা থোকা করিয়া পড়িয়াছে, মাথায় প্রজাপতির অনুকরণে কবরী

বাঁধা, তাহার চারিদিকে শুভ্র একছড়া ফুলের মালা জড়ান, মধ্যে— একটী রজনীগন্ধা...পরিধানে আশমানী রঙের আবরঙা কাপড় বক্ষ নিমায় ঢাকা। পায়ের আঙুলে চুট্‌কী। আঙুর গালিচার উপর বসিয়া সম্মুখে রূপার পাণদান লইয়া পাণ সাজিতেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সম্মুখের বৃহৎ দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহার পানে আকর্ণবিস্তৃতনয়নে কটাক্ষ করিয়া দেখিতেছে—আর একটু দূরে তাহার পরিচারিকা...শশী বসিয়া।]

শ। দাদাবাবু যে এখনও এল না...রাত যে দুটো বেজে গেল...তুমি বাপু কেমন কেমন—থাক থাক কেন যে ঝগড়া কর তা জানিনে, তার ত তোমা বই আর গতি নেই।

আঙুর—(হাসিল ... সুর করিয়া গাহিতে লাগিল ও পায়ের চুট্‌কীতে তাল দিতে লাগিল)—

"আর ভাল লাগে না আমার
বাঁধা কপির চড়চড়ি,
রয়ে রয়ে পড়ছে মনে শুল্প শাকের নপড়ি।—"

আর ও থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় ভাল লাগে না— বুঝ্‌লি শশী...এ রোজ ওই একঘেয়ে গান কর, আর মদ খাও, গান কর, আর মদ খাও—এ আর ভাল লাগে না শশী—

শ। কি যে বল তার ঠিক নেই, অমন সোনার চাঁদ বাবু—সোনা-দানা—অত আদর...তবু তোমার এ বাঁধা কপির চড়চড়ি ভাল লাগে না। কত পুণ্যি কর্‌লে তবে এমন হয় গো!

আ। শশি! আমার পুণ্যির ভাগটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই একে ভাগ্যি বলিস্‌? এই সত্যিক লোকের জুতো সোজা করতে কর্‌তে দিন কাটান—ভাগ্যি নয় বলিস্‌ কি?

শ। হ্যাঁগো হ্যাঁ—বল্লেই যদি হ'ত? তাও যদি বয়স থাক্‌ত তবে ত তোমার পুণ্যির ভাগ নিতুম্‌। আহা সে পোড়া যে

কবে এল কবে গেল তার ঠিকেনা নেই। আর এপথে আর কি উপায় আছে বল ?

আ। উপায়! উপায়! খুঁজে ত পাচ্ছিনি শশী—উপায় আর কি—এই নে তুই পাণ খা। (শশীকে পাণ দিয়া)—

"আর ভাল লাগে না আমার
বাঁধা কপির চড়চড়ি
রয়ে রয়ে পড়ছে মনে শুল্প শাকের নপড়ি
মজেছে মন কুমড়া শাকে দিয়ে তাতে ফুলবড়ি।"

বাবুকে আজ পাঠিয়েছি বাড়ী, রোজ আর মদের ঢেউ সাম্‌লাতে পারিনি, বুঝ্‌লি শশী ..বলেছি তোমার মাগের গলার নেকলেশ যদি এনে দিতে পার, তবে তোমার সঙ্গে ভালবাসা—তবে কথা। শশী তোকে সত্যি কথা বল্‌ছি, আজ পাঁচ বছরেও তাকে ভালবাসতে পার্‌লুম না, কেন তা বল্‌তে পারিনি। লোকে বলে, ঘর কর্‌তে কর্‌তে সয়ে যায়—কই বুঝ্‌লুম না—

শ। কিন্তু তা যা বল বাপু...বাবুর তোমা অন্ত প্রাণ...

আ। একটু কম হলে হাঁফ্ ছাড়্‌তে পার্‌তুম্ শশী—ওই জন্যেই ত অত জ্বালা...

শ। কি জানি বাপু, তোমার কথার ভাব পাইনে...

আ। (আপনার মনে গান—)

"সরু ধুতিখানি পরিতে না জানি
না জানি বাঁধিতে কেশ—
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়ে
বঁধু চলে গেছে কোন দেশ"—

সেই কথাই এখন মনে পড়ে লো—ওঃ সে কতদিনের কথা—তার ওপর দিয়ে দামোদরের বান ডেকে চলে গেছে—তবু মনে পড়ে—তখন—

(সুর করিয়া)

'না জানি বাঁধিতে কেশ'।

[নেপথ্যে—পথ বাহিয়া পথিক গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—]

অনুরাগে গল্‌বে তারি মন
কাঁটা তুলে বুকে নিয়ে কর্‌বে লো যতন
ওলো—পরশ রতন
চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি, 'ভালবাসি' গলা ধরে—

আ। বাঃ কি চমৎকার গান—আচ্ছা ওতো সবাই বলে, গলা ধরে আর ভালবাসি বলে, কিন্তু কি যে বলে—বুঝ্‌তে...তাদের কথার মাথামুণ্ড কিছু ত পার্‌লুম না। শশি তোকে মাইরি বল্‌ছি—যখন চুমু খায়, ঠোঁট দুটা পুড়ে যায়...তারা কি শান্তি পায় তা আমি ত বুঝিনি। এক এক সময়ে মনে হয় ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখি ঠোঁটে ফোস্‌কা পড়্‌ল কি না... [(নেপথ্যে)—চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' ভালবাসি গলাধরে] বেশ গলা মিষ্টি কিন্তু লোকটা পাগল নইলে অমন গান গাইতে পারে ..চল রাত হ'ল, শুইগে, আজ বুঝি মিন্‌সে আর ফির্‌ল না। আ-মর খোঁপাটা আবার খুলে যায় কেন...একটা রাত্রি ঘুমিয়ে বাঁচ্‌ব...

[নেপথ্যে রমেন্দ্র—আঙুর ! আঙুর ! আঙুর। কি আমি ভালবাসিনি বটে, এই দ্যাখ এই দ্যাখ তবে···]

আঃ—ওই নে মড়া বল্‌তে বল্‌তেই হাজির।

র। (রমেন্দ্র প্রবেশ করিয়া)—এই দ্যাখ তার নেকলেশ...কি আঙুর! কি আঙুর! আমি ভালবাসিনি—এই দ্যাখ আঙুর! আঙুর! আমি ভালবাসিনি ?

[নেপথ্যে গান—

চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে—]

বা ভাই বেশ বেশ, আঙুর! চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে।

আ। তুমি কেড়ে এনেছ?—

শ। (স্বগতঃ) এইত বলি ভালবাসা হুঁ...আর সেকথা...যৌবন যে কবে এল কবে গেল, তা জান্‌তেও পার্‌লুম্ না, দূর্—দূর্—

(হারের দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান)

আ। তুমি কেড়ে এনেছ?

র। আরে না। সে গলা থেকে খুলে দিলে, আবার বলে কি একটুখানি ব'স—হাহা...হাহা—আঙুর! কেমন এই হারে তোর হার আর আমার জিৎ—এখন এস ঢাল—কেমন এখন মদ খাবে কি না?

আ। ওত তুমি চেয়ে এনেছ, আমি ত কেড়ে আন্‌তে বলেছিলুম, ওত সে আমায় ভিক্ষে দিয়েছে, ও আমি নেব না—আমি কি তোমার ভিখিরী নাকি?

র। কি রকম...কি রকম...আমি তার গলার নেকলেশ ধরে টানাটানি করতে লাগ্‌লুম, সে খুলে দিলে...এ ভিক্ষে দেওয়া কি রকম—যাও, যাও ও সব বাজে কথা রাখ, ঢাল—ঢাল।

আ। না নিয়ে যাও তোমার ও নেকলেশ, ও আমি চাইনি, আমার যেমন অদৃষ্ট তাই ভিক্ষে নিতে যাব—যাও—যাও নিয়ে যাও... এই তুমি আমায় ভালবাস? না...

র। কি রকম—দেখ আঙুর—নাঃ—মদ খাবে কিনা—না—তুমি—

আ। না আমি মদ খাব না—কখন—খাব না—

র। খাবে না? খাবে না? খাবে না?

আ। না আমি মদ খাব না। যাও...

র। আচ্ছা চল্লুম—আর যদি কখন—

আ। কি—কি—কখন কি?

র। আর যদি কখন বলি; হুঁ...আর যদি কখন—

আ। কি কি বলনা—বলি বলি কি, বলেই ফেল—

র। না চল্লুম—বলব আর কি...চল্লুম—

আ। আর আস্‌তে হবে না ত?

র। দেখা যাবে ..

আ। বটে আচ্ছা দেখা যাবে—

র। দেখা যাবে—এই নে তোর মদ—কোন শালা—আর—

(মদের বোতল ও গেলাস ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল ...)

আ। আচ্ছা এই যেন মনে থাকে—

র। (নেপথ্যে) ..হ্যাঁ মনে থাকে।

আ। আর পারিনে; নিজেকে এমন করে মিথ্যা ভাণ করে আর পারিনে শশি! শশি! দেখ্‌ ত মড়া কোথায় গেল?...

(শশি জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল; দেখিল রমেন্দ্র টলিতে টলিতে যাইতেছে।)

শ। ওই যে—

আ। যাক্ গে মরুক মুখপোড়া—আচ্ছা কার জন্যে এ করি...কি সুখের জন্যে তা বুঝ্‌তে পারিনি—দূর···দূর—জীবনটা—মলেই বাঁচি আর ভাল লাগেনা—শশি! ও শশি! চুলোয় যাক, একটা রাত্তির ঘুমিয়ে বাঁচি—আর ভাল লাগেনা—শশি অ শশী—

(ডাকিতে ডাকিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল—আবার ফিরিয়া আসিল।)

আ। ওই যে রস কত—আবার ফিরে আস্‌ছে।

(রমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

র। দেখ আঙুর! আমি আর আস্‌ছিনি।

আ। তবে আর কি সখি রে মরে আছি···তা আবার বল্‌তে—আস্‌বার দরকারটা কি···

র। না তাই বল্‌ছি···চল্লুম···

আ। শোন—তোমার ও নেকলেশ নিয়ে যাও, তুমি কি মনে করেছ তোমার ওই নেকলেশের জন্যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি? কখন না...কখন না...দেখ আমি মেয়ে মানুষ...মেয়ে মানুষের মনের ধরণ বুঝ্‌তে পারি—যে ভালবাসে সে যে কত রকমে তার সেই তাকে চায় এ আমি বুঝ্‌তে পারি—আমি আমার ভালবাসার জিনিস না পেয়ে যে কষ্ট অনুভব কর্‌ছি, তোমার শোভনাও তেমনি কর্‌ছে—তুমি ত তা বুঝ্‌তে পার না... তোমার প্রথম স্ত্রী ইন্দিরা যখন গলায় দড়ী দিয়ে ম'ল—তুমি আবার বিয়ে কর্‌লে...তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী প্রফুল্ল...ভেবে ভেবে শুখিয়ে মরে গেল—তুমি আবার বিয়ে কর্‌লে—আজ শোভনা তোমায় তার গলার নেকলেশ তোমার তৃপ্তির জন্য খুলে দিলে—এ কথাটা ত তুমি বুঝ্‌লে না—আমার কাছে ভালবাসা খোঁজ—কিন্তু এত গুলা যে বিয়ে করলে কার জন্যে? তুমি ত আমার এখানেই পড়ে থাক—যখন টাকার দরকার হয় তখন একবার ওঠ, নইলে ত আর কোন সাড়াই মেলে না। আমি ভালবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে গেছি—তাই কেমন জান্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল—ঘরের বউরা কেমন ভালবাসে—মেয়ে মানুষের কাছে গয়না বড় আপনার,—তাতে মেয়ের কাছে মার গয়না আরো আপনার...তা যখন সে ত্যাগ করে হাতে তুলে দিয়েছে—তখন তাকে যে তুমি কেন বুঝ্‌লে না—এ দুঃখে যে আমি মরি···আমার জন্যে ইন্দিরা গেছে—আমার জন্যে প্রফুল্ল গেছে—আমার জন্যে ··আবার কি...মনে কর্‌ছ খুব বক্‌ছি—তা নয়। দেখ, তোমার এ সব ওই মদের নেশার মত···আমি জানি কাকে ভালবাসা বলে—আমি ভালবাসি কিন্তু তোমাকে নয়—আমি ভালবাসার আগুনে জ্বলে মর্‌ছি রমেন। রমেন! আমি আর তোমার রমণী নই···আজ আমার ভেতর ঝগড়া আস্‌ছে···আমি সত্যি বল্‌ছি—আমি তোমায় ভালবাসিনি—নারীর

লেখা মুছিনি—ভালবাসতেই হবে, ভালবাসি, কিন্তু তোমায় নয়। মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই গেছে...তবু আমি মেয়ে মানুষ···আমার নিজের মনের মত রূপ বুঝি আজও মেলেনি, তাই তোমায় ভালবাসতে পারিনি...

র। আঙুর! আঙুর! ইচ্ছে হচ্ছে···তোর বুকের ভেতর থেকে হৃদ্‌-পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই!

আ। (হাসিতে হাসিতে)··তা আমি জানি, কিন্তু নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ত ছিঁড়ে দিতে পার না···আমরা পারি—যাও, যাও··আমার সাম্‌নে থেকে সরে যাও...কিসের আশায় ভালবাস...কিসের জন্যে আঙুর, আঙুর করে এস··আমি ত তোমায় ভালবাসিনি··· তোমার টাকা চেয়েছি···তোমায় চাইনি···যাও যাও আমার সাম্‌নে থেকে সরে যাও, অনেক...আজ অনেক বছরের ভুল ভেঙ্গেছে।

র। হ্যাঁ যাচ্ছি...যাচ্ছি...টাকা! টাকা! টাকা! আঙুর! আঙুর! যাচ্ছি...ওঃ! স্বপ্ন! স্বপ্ন...পায়ের তেল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, স্বপ্ন! স্বপ্ন!

আ। নেকলেশটা নিয়ে যাও.........পাঁচ বছর পরে এ কথা বল্‌তে তোমার কষ্ট হ'ল—কিন্তু সে দুঃখ আর নেই ..আমার আজ হাসি করেছে, হাসি করেছে, হাসি চাইনি হাসি পাইনি, তবু হাসি করেছে...এ হাসি ত তুমি বুঝ্‌বে না...দেখ পাথর বসান রাস্তার পাথরের খোঁচার চেয়ে এ ভালবাসার রাস্তায় আরো খোঁচা ..তাই হাসি করেছে ..

র। স্বপ্ন! স্বপ্ন! ওই...ওই...বেশ ভেসে গেল—

আ। হ্যাঁ বেশ ভেসে গেল ..হ্যাঁ আমার, সে একদিনের সুর ভেসে গেছে—কিন্তু তার সেই রেশ এখনও বাতাসে গুমরে গুমরে মরছে...সেই সুরে আমার প্রাণের বঁধু একদিন গেয়েছিল—আর আমি তাঁতির মেয়ে সেই মাকুর বঁ-বঁ ডাকের

সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে দিব্যি করেছিলুম যে আমার এই বুকের ঘর, আমার এই মুখের চুমু মৃত্যু পর্য্যন্ত সে ছাড়া আর কার' জন্যে ধরে রাখ্‌ব না...কিন্তু ওঃ...আজও সেই তোমার বুকে তোমার মুখে তার স্পর্শ মনে করে চোখ বুজে থাকতুম্‌, চোখ খুলতাম্‌ না...পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তোমায় বুকে জড়িয়ে মনে কর্‌তাম তাকেই বুকে করে রয়েছি— কিন্তু এমন করে দুটো হওয়া আর চলে না। যাও যাও আর নয় ..আমি তাঁতির মেয়ে পদি একটা, আর এখন এই পদ্মিনী আঙুর আর একটা ..ওই শয্যা ওই যাতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে সব ঢেলে দিতাম সে কি—সে কি উঃ—বলা যায় না, আর বলা যায় না...

র। ওঃ! ওঃ! (বুকে হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল, তারপর সোজা হইয়া মুখ তুলিয়া চলিয়া গেল)

আ। আঃ ..একটা যেন পাথর বুক থেকে নেবে গেল এতদিনে তবু একটা সত্যি বল্‌তে পেরেছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[রাজপথ—একটা ফুলওয়ালা ফুল বেচিতে বেচিতে হাঁকিতেছে ...রাজপথ বাহিয়া দুই চারিজন লোক চলিতেছে...ফুলওয়ালা গান গাহিতেছে আর হাঁকিতেছে—"চাই বেলফুল, চাই বোঁটাকাটা বেলফুল"—]

এনেছি চাঁপা-কলি ফোটেনি যা
ফুটবে ব'লে
ও মুখের সোহাগ পেলে আপ্‌নি দেবে
হৃদয় খুলে
..."চাই বেলফুল"
আকুল করে এ ফুল আমার
মন ভুলে ছায়

মালা না পর্‌লে গলে প্রাণ
করবে হায় হায়
...ফুল শুখিয়ে যে লো যায়...
কিনে নাও এখনও ফুল
দেব ফেলে বাসি হলে,
আজের সোহাগ রাখ্‌লে তুলে
বল...কাল কি হবে ঝরে গেলে
...“চাই বেলফুল”...

[রমেন্দ্রের প্রবেশ। রমেন্দ্রের চাদর পথের ধূলায় লুটাইতেছে। রমেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঊর্দ্ধে তাকাইতে তাকাইতে চলিতেছে...পায়ের ঠিক নাই, টলিতেছে...]

ফু—মশায়। ফুল নেবেন? চাঁপা চাঁপা কলি, এখনও ফোটেনি, বাতাসে ফোটার মত নিশ্বাস পেলে ফুটবে—নিন্‌ না...

র—অ্যাঁ...অ্যাঁ...ফুলের গাছ-শুদ্ধ জ্বলে গেছে, জ্বলে গেছে...যা যা...এক গেলাস মদ খাস্‌ ত বল্‌..ফুল কি হবে বল্‌...

ফু—কাল সকালে যে খেতে পাব না মশায়...এ মালা ক'ছড়া যদি বিকোয় তবেই কাল খেতে পাব—মদ কোথা থেকে খাব? ফুল আর কি হবে—আমাদের সবই পেটের জন্যে।

র। না.. না...ও সব বুঝিনি, তুই মদ খাস্‌ত বল ক বোতল খাবি ...শোন্‌ না, শোন্‌ না, যাচ্ছিস কেন? পেটের জন্যেই ত— পেটের জন্যেই ত—বল্‌না আমি ও খুব বুঝি। মদ খাবি? মদ খেলেই পেট ঠাণ্ডা হবে।

ফু। না মশায়, আমার পরিবার মর-মর। এই ফুলের মালা ক'ছড়া বিকোয় ত কাল সকালে তার পথ্য হবে...আপনাদের ফুর্ত্তির প্রাণ...যান্‌ মশায়...চাই বেলফুল...মদ খেলে পেট ঠাণ্ডা হবে! বেশ বলেছেন মশায়...

এ মালা পর্‌লে গলে,
পায়ে নাগর পড়ে ঢুলে ;
চাই বেলফুল...

র। আচ্ছা তোর ও মালার দাম কত...পায়ে পড়ার দাম ত আমি খুব জানি...

ফু। আপনি ত নেবেন না ? কেন আর আমায় ? এদিকে রাত ঢের হয়ে গেছে মশায়, সন্ধ্যাবেলা বেরুতে পারিনে। সন্ধ্যা-বেলায় মাগী বের হতে দ্যায়নি—তার বুকে বড় ব্যথা ধরেছিল...

র। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁরে তোর পরিবার তোকে খুব ভালবাসে—এ্যাঁ হ্যাঁরে...

ফু। পরিবার ? বলেন কি মশায় ! পরিবার ভালবাস্‌বে না—সকলের পরিবারই ভালবাসে...

র। হ্যাঁরে, আচ্ছা ফুলওয়ালা, শুধু শুধু কি ভালবাসা হয়, টাকা না হলে···

ফু। টাকায় কি ভালবাসা হয় মশায় ? সে কি কেন্‌বার জিনিষ ? কি জানি মশায় আমরা গরিব লোক।

র। তবে কি রে, হ্যাঁরে ফুলওয়ালা—ভালবাসা কা'কে বলে রে ? ভালবাসা এ্যাঁ...বল্‌না এ্যাঁ।

ফু। (স্বগতঃ) লোকটা পাগল নাকি...(প্রকাশ্যে) কি জানি মশায়, আমরা গরিব লোক, দিন আনি দিন খাই, ভালবাসার আমরা কি ধার ধারি...ভালবাসা—ভালবাসা ! ভালবাসা ভালবাসাকেই বলে...যান্ মশায়—

এ মালা পর্‌লে গলে,
আপনি নাগর পায়ে ঢলে ;
...চাই বেলফুল...

র। শোন্ না, শোন্ না, এই নে, এই নে, এই তুই পাঁচটা টাকা নে।

ফু। মশায়! শুধু শুধু আপ্নার ঠেঙে টাকা নেব কেন? আর আমার এ মালার দাম ত অত নয়।

র। তা হোক্, শোন্ তুই এই টাকা নে, কাল ছাখ্ আবার যখন টাকার দরকার হবে, তবে আমার ওই বাড়ী, ওখানে যাস্, তোর যত টাকার দরকার হয় নিয়ে যাস্...আর ছাখ্ তোর ওই মালা তোর পরিবারকে দিস্—বুঝ্লি? যাঃ তুই ত মদ খাবিনি...যাঃ।

ফু। সে কি মশায়, অত টাকা আমি অম্নি কেন নিতে যাব?

র। অম্নি কি রে শালা, তোর কথার দাম নেই...মদের দাম লাগে, পাণের দাম লাগে, ভালবাসার দাম লাগে, শালা কথার দাম নেই? তোর কথা কিনে নিলুম,—যাঃ।

ফু। যে আজ্ঞে, কিন্তু আমি ফুলই বেচি, কথা ত বেচিনি...

র। আমি অম্নি কথাও কিনিনি—যাঃ শালা...

ফু। লোকটা মানুষ না...দেবতা......যে আজ্ঞে নমস্কার।

(ফুলওয়ালা তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান করিল।)

র। মদের নেশা ছুটে গেছে...মগজের অন্দর মহালে কে যেন ডাভশ্ মাচ্ছে ..কিন্তু সে নেশা ত ছুট্‌ল না—ভালবাসা! ভালবাসা! সে নেশা ত ছুট্‌ল না...(ঊর্দ্ধে তাকাইয়া) এত ত তারা আকাশে জ্বল্‌ছে, চাঁদও ত দিব্যি হাস্‌ছে, এত পাথর কাঁকর দেওয়া রাস্তা মাড়িয়ে চলেছি, কেউ বল্‌তে পার কোথায়—কোথায়—ভালবাসা কোথায় পাওয়া যায়? কেউ বল্‌তে পার ভালবাসা কা'কে বলে? তুমি গ্যাসের আলো, তুমি যে দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছ ...অম্নি জ্বল্‌ছ...ভালবাসা...ভালবাসা...হাহা-হাহা—প্রাণটা কেবল হাহা করেই গেল ..তুনিয়াটা কেবল পোড়া আগ্নেয়গিরির হাহায় ভরে উঠেছে...মদের রসে কল্‌জে জ্বলে, ভালবাসার রসেও কি কল্‌জে জ্বলে যায়? ওঃ কল্‌জে পোড়ার গন্ধ যেন বাতাসে

ভেসে আস্‌ছে, হায়! হায়! মদের নেশা আর ভালবাসা...বলি প্রাণ এতদিন ত্বে কিসে চতুরঙ্গ্ হয়ে আছ, নেশা না ভালবাসা মিথ্যে না সত্যি...নেশা আর ভালবাসা! মিথ্যা না সত্যি?

চতুর্থ দৃশ্য।

[রমেন্দ্রের বসিবার ঘর...ঘরটা আবর্জ্জনায় ভরা, ধূলায় মলিন, জানালার ধারে মাকড়সা জাল বুনিতেছে, গৃহের দেয়ালের চিত্রগুলিও ধূলিক্লিন্ন। কোন ছবিখানার পেরেকের দড়ী একদিক ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোন ছবিখানা উল্টাইয়া রহিয়াছে। জানালার পর্দ্দাগুলা মলিন ও ছিন্ন; তাহার মধ্যদিয়া সন্ধ্যাসূর্য্যের আলো গৃহমধ্যে আসিতেছে। খড়্‌খড়ির উপর একটা দাঁড়কাক বসিয়া ক-ক কোয়া ক-কা করিতেছে...রমেন্দ্র ধূলায় ধূসরিত...মাথার চুলগুলি রুক্ষ, নাসিকা রক্তবর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে মদের বোতল ও গেলাস, মদ ঢালিতেছে আর পান করিতেছে।]

র। (মদ ঢালিতে ঢালিতে)—ঢাল্—ঢাল্, খুব ঢাল্, নেশা জম্‌ছে না। সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে নেশা জম্‌ছে না... বরফের মত, বাঃ বাঃ—বাবা যেখান দিয়ে যায়—শালা জানান্ দিয়ে যায়...ঢাল্...ঢাল্...(দেয়ালের ছবির দিকে তাকাইতে তাকাইতে)...আচ্ছা ব্যাধ তুই যে হরিণ তাড়া করলি, ও শালার হরিণ ত দিব্যি পালাল বাবা, ও তোমার তাড়াই সার। ছোট্, ছোট্, ছোট্,...আমি শালাও অমনি ছোট্...ছোট্ ছোটু...ওঃ আঙুর! আঙুর! না না ডোবাও। সব ডোবাও সব...আঙুর! আঙুর! সব ডোবাও—ওঃ সেই রাতের পর আর দেখা হয়নি—উঃ দিনটা যেন পাহাড়ের মত, নড়্‌তে আর চায় না—ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্...ওঃ আঙুর! আঙুর! নাঃ এতক্ষণে কি আর তার রাগ পড়েনি, রাগ পড়েনি ..না না বলেছে ভালবাসিনি ভালবাসিনি...ওঃ না বাস্‌লে ত বয়ে গেল ...ঢাল্ ঢাল্ বয়ে গেল . রাতও বুঝি বয়ে গেল ..না যাই

একটা চোখের দেখা...না না...সে যে পর্দ্দা ফেলে দিয়েছে, ওঃ ওঃ...ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্...আঙুর! আঙুর! বাঃ মাকড়া তুই যে খুব জাল বুনছিস্...

[ধীরে ধীরে দরজার সম্মুখ দিয়া শোভনা প্রবেশ করিল...]

র। এই যে তুমিও কি জাল বুন্‌তে এলে নাকি...

শো। জাল বোনা ত আমার কাজ নয়? কি করছ আর মদ খেয়ো না। বুঝ্‌তে পারছ না তোমার পায়ে পড়ি আর মদ খেয়ো না... আচ্ছা কি কর্‌লে তুমি শান্তি পাও বল আমি তাই করি... আমার ত সবই আছে, কি তুমি চাও?

র। শান্তি...শান্তি...শান্তি নয়, শ্রান্তি—শ্রান্তিও ভ্রান্তিতে দাঁড়িয়েছে ...এখন কল্‌জে যাতে ঠাণ্ডা হয় তাই করছি তাই ঢাল্‌ছি...ঢাল্ ঢাল্—বকিয়ো না—যাও আঙুর বলেছে আমায় ভালবাসে না। পাঁচ বছর পরে আঙুর বলেছে আমায় ভালবাসে না ..ওঃ ওঃ ভুল...ভুল...ভুল...সব ভুল—জীবনটাই ভুল...যাও যাও... শ্রান্তি শ্রান্তি—বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি...ক্লান্ত—আঃ ঢাল্ ঢাল্ তবু নেশা জমেনা, কল্‌জে জ্বলে যায়...তবু নেশা জমেনা...ওঃ ওঃ ভালবাসা না সবই নেশা...নেশা...জীবন-টাই একটা নেশা...ছুটেছি...কিসের জন্যে, কার জন্যে...আঙুর আঙুর! বল্‌লে ভালবাসিনি...ওহো...

শো। আমি ত তোমায় ভালবাসি...আমি ত তোমায় ভালবাসি... আমার এই রূপ, এই যৌবন, এই প্রাণের বুকভরা আশার সোহাগ তোমার তরেই ত ধরে রেখেছি প্রিয়তম, এতে কি তোমার ভালবাসা মেটে না? এতে কি তোমার তৃষা মেটাতে পারে না? আমি যে ফুট্‌তে ফুট্‌তে ফুটে উঠ্‌ছি, এ যৌবন বনে পিক কলকণ্ঠের স্বরে আমি যে তোমায়ই খুঁজছি ...জীবন হতে জীবনে, স্বপ্ন হতে স্বপনে, আমি যে তোমারি, তোমায় ভালবাসি—আমি যে তোমারই নারী...

র। ঢাল্, ঢাল্, ঢাল্, কল্জে জ্বলে গেল, যাও যাও কে তোমার ভাল-বাসা চায়? কে...কে তুমি ভালবাসার কি জানি? কিছু না...

শো। ছাখ, ফিরে ছাখ, তোমার জন্তে এমন করে সেজেছি, তবু ফিরে দেখ্‌বে না। ছাখ, ছাখ, সেই ত আমি ফিরে দেখি আমার পায়ের নখেও চাঁদ সূর্য্যি লুটিয়ে যায়—ছাখ, ছাখ, আমি পা পাতি—তার ছায়ায় কমল ফুটে ওঠে...বিধি রূপ দিয়েছে, প্রাণে ভাব দিয়েছে, সেই ভাব দিয়ে এ রূপকে আরো ফুলের কেয়ারিতে তৈরী করে ভাবে ভাবে গড়ন গড়িয়ে তুল্‌ছি। পাপড়িতে পাপড়িতে ঢেউ তুলে ফোটাচ্ছি—এতেও তোমার শাস্তি হবে না? এই ত রূপ—রূপ...কি চাও সব দেব, কত ভোগ কর্‌বে বল সবই দেব; তবু—তবু—ভালবাস্‌তে পার্‌বে না—ভাল যে বেসেছি আমি...তুমি কি চাও, কত ভালবাসা চাও—এ অন্তরে যে ভাব সমুদ্র হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে রূপের আঁকর দিয়ে তান তুল্‌ছে। এ রূপের গান তোমার ভাল লাগে না প্রিয়তম?—প্রিয়তম...ভাব দিয়ে রূপ সৃষ্টি কর্‌ছি। রূপ—রূপ—তোমারই জন্তে, তুমি ভালবাস্‌বে বলে তাই আমার এত ভাবন...তাই ত আমার এত শোভা, তাই ত আমি শোভনা...

র। চোখে ফোটে ফোটে না, চোখে ভাসে ভাসে না, কানে পশে পশে না—কোথাকার কবেকার কেমন যেন কোন ...কোন...জীবনের সাদৃশ কার রূপের ভাবনা সেই—সেই তোমার ভাবন...না!—না—কল্‌জে জ্বলে যায়—আঙুর! আঙুর! যাও যাও, কে তোমায় চায়...যাও...যাও কে তোমায় চায়...চাই আঙুর...চাই রস...চাই সুখের সেই—অহো কল্‌জে জ্বলে গেল...যাও...যাও...আমি আঙুর চাই...যাও—সরে যাও...যাও...

শোভা। রস, রস, রস, চাও, রস? অফুরন্ত ভাণ্ডার ভরা কত রস …কত বিচিত্র সুবাসে ভরা অহর্নিশি তোমার তরে আহরণ করিছি। নিশিদিন ভাবসমুদ্রে চন্দ্রসূর্য্য নিঙড়ে নিঙড়ে সুধার আকর—ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখেছি। কত রস চাও প্রিয়তম…দেহের শিরায় শিরায়…বর্ণের লাবণ্যপ্রভায়, অঙ্গের ললিত তারল্যে, স্পর্শের শিহরণে, মুখের মলয় মারুতসম অন্তরের সুবাসে, আঁখির দীপ্তিতে, বায়ুর তরঙ্গ মন্থন করে সপ্ত স্বরের মিলনে যে কণ্ঠের স্বর তুলেছি, তাতে রস নাই, আরো রস আরো…আরো…বল কি চাও…যৌবন-তরঙ্গ তুলিয়া অফুটন্তকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে মালার মত তোমার সর্ব্বাঙ্গে বেড়ে দেব। বল বল প্রিয়তম…আরো রস…কত বিচিত্রসুধা চাও…বল…বল হে তৃষাতুর! কোন্ সুধা চাও বল। দ্যাখ দ্যাখ কি মধুচক্র এদেহে রচনা হয়েছে… পিও, পিও, প্রাণভরে পিও, তাই দানের জন্যই আমি রচিত হয়েছি… দেহ প্রাণ মন জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব ত তোমারি প্রিয়তম!

রমেন্দ্র। ঝিম্ ঝিম্ মস্তিষ্ক আমার, শিরায় শিরায় রক্ত-স্রোত ধায়, কি রোমাঞ্চ উঠে কুতুহলে, পল পল অনুপল কোন জ্ঞান নাই, দেশ কাল সব ডুবে গেছে। ওহো তবু অগ্নি জ্বলে উঠে বুকে, কল্জে পুড়ে যায়…আঙুর! আঙুর!… যাও যাও…সরে যাও…তোমারে আমি ত চাই না…যাও… ও রূপে মন বুঝে ওতে ডুবতে পারি না…যাও যাও… কল্জে জ্বলে যায়…ঢাল্…ঢাল্…ঢাল্…ওঃ তবু নেশা জম্‌ল না…তবু নেশা জম্‌ল না।

শো। প্রিয়তম, প্রিয়তম, আমি নিজকে জানিয়ে, নিজেকে এমন করে গড়ে তোমার কাছে ধরা দিলাম, সব দেওয়া নেওয়ার পথ খুলে দাঁড়ালাম…তবু…তবু…জীবনে কত ঝড় তুলেছ… সেই ঝড়ের শেষে যে শান্তির মাধুরী—তোমার জন্যে বুকের

লজ্জাবাস খুলে ফেলে এলাম...সর্ব্বকান্তি নগ্ন করে দিলাম, বাতাসের পর্দ্দা পর্য্যন্ত রাখ্‌লাম না...যে রামধনু-আঁকা প্রাণের পাখা খুলে দিয়ে মহাসপ্নের জাগরণের মত জীবন সৃষ্টি করে তুল্‌লাম তাতে তোমার শান্তি এল না...তবে... কিসে বল—রূপে নয়, রসে নয়, শব্দে নয়, স্পর্শে নয়, গন্ধে নয়...প্রাণে নয়, মনে নয়, তবে...তবে, কিসে, কিসে অফু-রন্ত ভাণ্ডারও যে আমার ফুরিয়ে এল, তবে...তবে...তবে... প্রিয়তম! হায়! বিধি একি দানবের সৃষ্টি...এ নয়নে অন্তরের সে দৃষ্টি কি নাই ..নয়ন! নয়ন! তুমি কি বিফলে যাবে...

শোভনা রমেন্দ্রের মুখের পানে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ...তাহার মাথার বেণী খুলিয়া পায়ে লুটাইতে লাগিল।]

রমেন্দ্র। (রমেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল) না বুঝি না ধরি ছবি একি কোন গান, যেন স্বপ্ন জীবনের পাতে, খুলে দাও রুদ্ধ দ্বার। তোমার সকল ছবি পাই না যে দেখা—কত রূপ, কই...কই...ধরি ধরি...না না...না না; যবনিকা পড়েছে নয়নে...রূপ! রূপ! আঙুর! আঙুর! ওহো কলজে জ্বলে গেল...

[দূরে পূর্ব্বাকাশে তখন চন্দ্র উঠিল...জানালার ধারে একটা চাঁপা গাছের ডাল হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, আর তাহার সেই মাদকতাভরা সুবাস ভাসিয়া আসিতে লাগিল...]

শো। হে পিয়াসি! মিটল না কোন তৃষা তোমার? কিসের পিয়াস... কিসের পিয়াস...বিশ্বগ্রাসী কোন ক্ষুধা—এই...তবে...তবে... বৃথা এই স্বর্গের গড়া রক্ত মাংস, বৃথা তবে এই দেহের কান্তি এই লাবণ্যের বর্ণভঙ্গিমা! তবে যাক্, সবই যাক্...এই প্রাণময় স্বর্গের এ অনুপম সৌন্দর্য্যও সে তৃষ্ণা মিটাতে পার্‌লে না...হা বিধাতা! ধিক্ নারীর এ উচ্ছল যৌবন, ধিক্ তোমার এ সৃষ্টিকে, ধিক্ তবে প্রাণের এ খেলায়...জীবন তবে কোথায়... কোথায়...

রমেন্দ্র। কে জানে কোথায়...ছাথ কোথায়...আমি খুঁজে দেখ্‌লাম —নেশা...তুমি খুঁজে ছাথ...নেশা কি ভালবাসা কে জানে কোথায়...ঢাল্‌ ঢাল্‌...নেশা...নেশা...জ্বালা জ্বালা ..

শো। জ্বালা! জ্বালা! তুমি এক পথে জ্বালা সঞ্চয় করেছ, আমি অন্যপথে জ্বালা সঞ্চয় করেছি ..পর্দ্দায় পর্দ্দায় সে বাজ্‌না বেজে উঠেছিল যে বাজ্‌না বেসুর হয়ে গেছে...একটা পর্দ্দায় বেসুর বেজেছে...জীবনের সমস্ত গানটাই বিফল হয়ে গেল...সংসার, আচার, সকল দিক ফেলে দিয়ে তোমার পথের আলোর দিকে তাকিয়েছিলাম; পথের আলো কুয়াসায় ছেয়ে দিলে; এখন যে হাঁতড়ে মরি...তোমার আলোয় তোমায় দেখিনি... তাই কি সব এমন হ'ল...জ্বালা...জ্বালা...আমার আমি নিয়েই এত ব্যস্ত, তাই কি তোমায় পেলাম না...তাই তুমি ও সব ভাসিয়ে দিলে...

রমেন্দ্র। যদি বা সুর নেশা জমে আসছিল, তুমি আবার তাকে বেসুর করে তুল্‌লে...নেশা ..নেশা...কেন চটাও...ওঃ আঙুর! আঙুর!

[রমেন্দ্রের চাকর সুদর্শন নেপথ্যে গান ক'রতে করিতে আসিতে-ছিল "কাঁই কি রাবু রে পিক"। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল...কি বলিতে গিয়া সাম্‌লাইয়া লইল...]

সুদর্শন। মনিম! মনিম! সোহি...ইয়াড়ি পরভু পরুষত্তম!...মুই কি কইছন্তি...বাবু! বাবু! সোহি আঙুর বাবু আইছন্তি পরা ...সোহি আঙুর বাবু...

রমেন্দ্র। সুদর্শন! সুদর্শন! না...না...বল্‌গে দেখা হবে না...না না... শোন্‌...কে কে আঙুর!

শোভনা। কে—কে—ওঃ...

[শোভনা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল]...

সুদর্শন ভয়ে জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া যেন কত অপরাধ করিয়াছে...
"সো মু অপরাধ ভঞ্জন করু মনিমা !"
রমেন্দ্র। (উঠিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল)...আঙুর ! আঙুর !

পঞ্চম দৃশ্য।

[রমেন্দ্রের বাড়ী...দালান। দালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আঙুর... একখানা মলিন কাপড়পরা, মুখখানা শুখাইয়া লম্বা হইয়া গেছে...চক্ষু ছল ছল...আর একদিকে শোভনার পিতা হরিশচন্দ্র আসিতেছিলেন। হরিশবাবু বৃদ্ধ, পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়া গেছে।]

আ। (মাথার অবগুণ্ঠন টানিয়া ..হরিশবাবুর দিকে তাকাইয়া)
(স্বগত) কতক্ষণ আর দাঁড়াব, (প্রকাশ্যে) সুদর্শন ! ডাক্ না তোর বাবুকে...

হরি। কেগা ওখানে দাঁড়িয়ে...কে...অন্ধকারে...
[আঙুর নিরুত্তরে চুপ করিয়া ঘোম্টা টানিয়া দিল]

হরি। সুদর্শন। সুদর্শন !
[রমেন্দ্র টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল]

র। কই...কই...এঃ (শ্বশুরকে দেখিয়া)...

হরি। ওঃ বুঝেছি...বাঃ বাঃ...এরি জন্যে তোমার হাতে আমার একমাত্র কন্যাকে তার জীবন মরণ ইহকাল পরকালের ভার দিয়েছিলাম...বাঃ বাঃ...বাবাজী আমায় চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করালে—দেশবিখ্যাত বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান বলে মহাকৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলাম...বাঃ বারে আমার শালগ্রামশীলা ! রমেন্দ্র ! তোমার লজ্জা বোধ হ'ল না...সুদর্শন ! সুদর্শন ! পা ধোবার জল দে...কৌলিন্য ! কৌলিন্য...বল্লাল ! তুমি দানসাগর বটে...বাঙলার মাটি কি বল্লালই গড়েছিল, আর তুমি বল্লাল এই মাটিকে কি মুকুটই পরিয়েছিলে...তবু বাঙলা, তোমায় আজ ...বুঝতে পারে না...তোমার বীজ কি চমৎকার ফল ফলি-

য়েছে...গৌরব কর, বাঙ্‌লা ইতিহাসের গৌরব কর...তবু বাঙ্‌লা তোমায় আজ বুঝ্‌তে পারেনা তার চৌদ্দপুরুষের ভুল... গলায় পাথর বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিইনি কেন...

[বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন]

আ। তোমার নেকলেশ ফিরিয়ে নাও...তোমার নেকলেশ ফিরিয়ে দেবার জন্যে এসেছি...

র। আঙুর! আঙুর!

আ। না, তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা কইবার অবসর নেই...

র। আঙুর! আঙুর! ঠিক্...ঠিক্...কার কোন অবসর নেই... ওহো ঠিক্...পাঁচ বছর পরে আমার কিন্তু খুব অবসর হয়েছে...

আ। আমি চল্লুম আর তোমায় কি বল্‌ব...আমি যে তোমায় ভাল-বাসতে পারিনি সেজন্যে আমিই দুঃখী...পার্‌লে বুঝি...

[আঙুর অগ্রসর হইল—রমেন্দ্র উন্মত্তের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল। আঙুর অঞ্চল ছাড়াইয়া চলিয়া গেল .রমেন্দ্র সেইখানে বসিয়া পড়িল...]

সুদ। সো হি মনিম মৃত কছু না জানি পরা...সোহি মনিম অবধাড় মৃত কইছিলা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শোভনার ঘর···শোভনা দূরে সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া... গৃহকোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে, শোভনা সেই পোড়া বাগানের দিকে তাকাইয়া...তাহার চক্ষু জলে ভরা...হরিশচন্দ্রের প্রবেশ...]

হরি। তুইও মর্ আমিও মরি...শোভনা সেই ঠিক্...আর এ সব দেখ্‌তে পারিনে...শোভনা, তোর মা অনেকদিন এগিয়ে গেছে, আমাকে যে বামনী খাড়ু হাতে দিয়ে কেন এখন ডাকে না তাই ভেবে উঠ্‌তে পারিনি...কুলের মাথায় মারি ঝাড়ু...

[শোভনা পিতার মুখের পানে একবার চাহিয়া আঁখি নত করিল —তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল।]

শোভনা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) বাবা...কখন এলে...

হরিশ। এই আসছি...আমি কাল বৃন্দাবন যাব। আর কি কর্‌ব ? যা ছিল সবই তোকে দিয়েছি...সবই তোর...কিন্তু বুড়া বয়সে বড় অশান্তি শোভনা! আজ যদি তোর মা থাক্‌ত...এসব আর দেখ্‌তে পারিনি। গলায় পাথর বেঁধে তোকে গঙ্গায় দিই নি কেন তাই ভাবছি...যাই...একবার বেয়ানের সঙ্গে দেখা করিগে...

(হরিশের প্রস্থান)

শোভনা। রূপ মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা, রস মিথ্যা, আমার ভাণ্ডারে কিছু নেই তবে—কিসে এ হবে...ওইত আরসিতে দেখ্‌ছি তরঙ্গে তরঙ্গে কাণায় কাণায় রূপ চল্‌কে পড়্‌ছে, এ রূপেতে জয় হল না তবে কিসে হবে! আরসিতে রাত্রে দেখ্‌তে নাই, শেষ দেখিনি। আমিও ত আর রাত দেখ্‌ব না। রূপ ত তবে কিছু নয়—চাই জীবন চাই—প্রাণ—এই রূপের পেছনে যে প্রাণ আছে তা দিলে কি হয় না ? এরূপের শেষ ত মৃত্যু...মৃত্যু...মৃত্যু—এ মরার পেছনে দেখ্‌ছি জীবন। ওই গোলাপ পুড়ে যাওয়ার পিছনে দেখ্‌ছি আর একটা জীবন...জীবন দিলে জীবন পায়। তবে স্বামিন্ প্রিয়তম, সব দিতে পারিনি তাই তোমায় পেলাম না। সব দিলেই তবে তোমায় পাব...পাবার জন্যে দেব কি ? না, দেবার জন্যেই দেব...রূপ মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা, রস মিথ্যা, এ মৃত্যুও মিথ্যা। মিথ্যা তবে এই জীবন...এ জীবন দিলে তবে জীবন পাওয়া যায়...তবে...তবে...জীবনের শুবে জয় নয়...জয় তবে মৃত্যুতে, না মৃত্যুর পরে...কিন্তু...কিন্তু...বাঃ এইত ঠিক্। ভাবনা কি! একটা গলায় দড়ী দিয়ে, একটা শুকিয়ে, আর একটা তবে পুড়ে...দিক্ হারাতে বসলাম নাকি—না না ঠিক্—ঠিক্

এই ত উপায় রয়েছে...(এক বোতল কেরোসিন তৈল ঘরের কোণ হইতে লইয়া) দিতে হবে—দিতে হবে—দিলেই তবে পাব.। তবে এই নাও তোমার সকল ভোগের অগ্নিতে নিজেকে দিলাম তোমারই জন্যে...স্বামিন্...আমাকে দিতে হলে আমাকে দিতে হবে। তবে তাই নাও, তোমার সকল ভোগের জ্বালা যেন আমার দাহনে শেষ হয়। নাও অগ্নি, শুদ্ধি কর—স্বামীর ভোগের অগ্নিতে ইন্ধন করে দিয়েছি...ভোগের শেষ কর... শুদ্ধি কর...জীবন নাও...তাঁর জীবন দাও।

[শোভনা এক বোতল কেরোসিন সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিয়া...ঠিক্ বুকে অগ্নি লাগাইয়া দিল]

শোভনা। আঃ কল্জে ঠাণ্ডা হয়ে গেল...কল্জে জ্বলে যায়...কল্জের আগুন আমি নিলাম। স্বামিন্ তোমার হৃদয়ে শান্তি আসুক। মরণ! জয় তোমার নয়, জয় আমার, জয় জীবনের ...মরণ! মরণের—তোমার জন্য মরিনি...জীবনের জন্য—জীবন দিলাম জয় মরণে...(শোভনা স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল) বাবা! আর তোমার শোভনার ভাবনা ভা্তে হবে না। [শোভনাব পিতা...দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—]

হরি। শোভনা! শোভনা! কি কর্লি...কি কর্লি...আর সাম্লাতে পারলিনি? বাঃ বাঃ...

(শোভনার কাপড় ছাড়াইতে গিয়া তাঁহার কাপড়ে অগ্নি লাগিয়া গেল...শোভনাও পড়িয়া গেল...শোভনার পিতাও জ্বলিতে জ্বলিতে... পড়িয়া গিয়া...)

তবে আয় আয় বাপে ঝীয়ে এক সঙ্গে যাই...আয় মা...মা...বেশ বৃন্দাবন যাত্রা হ'ল...সে কোন নব বৃন্দাবন!

[হরিশচন্দ্রও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন...এদিকে...সুদর্শন...ছুটিতে ছুটিতে আসিল।]

স্থ। কি হইল পন্না...হায়! পরভু পরুষত্তম হায় পরভু পরুষত্তম... সো মুই কি কম্নিলা...অপরাধ ভঞ্জন করু হা পরভু পরুষত্তম ...সোহি মনিমা এমতি হইলা পন্না...

[রমেন্দ্রের মাতা ও রমেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।]

রমে-মা। ওরে আমার সব ঘরদোর সব জ্বালিয়ে দিলে। আরে আঁটকুড়ির ব্যাটাবেটী! এমন কর্‌লি, ওরে আমার অমন ঘর জ্বলে গেল রে...ওমা এমন হাড়ে নাড়ে জ্বলন—

র। চুপ্ চুপ্—চারিদিকে হাহা কর্‌ছে, চুপ, দেখ্‌ছ না—মা সেই গোলাপ পুড়ে গেছে, চুপ্...চুপ্...চারিদিকে হাহা হাহা... হাহা হাহা হাহা...ফুট্‌তে চেয়েছিল, ফুট্‌তে চেয়েছিল, ফুট্‌তে পেলে না, পুড়ে গেল...ছাখ ছাখ কেমন আলো...আমার আমার তাপে...হাহা ভালবাসা...হাহা...ঘর জ্বলে আলো হয়ে গেছে। মা, মা...নেশা ছুটেছে, নেশা ছুটেছে...ও পোড়াই ভালবাসা...ওই পোড়াই তিনটে জীবন দিয়ে একটা জীবন চিনে নিলে। বাঃ বাঃ বারে নেশা আর ভালবাসা।

স্থ। হা! পরভু পরুষত্তম অবধাড় সোহি অপরাধ ভঞ্জন করুন।

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৫]

তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা।

কোনও বিষয় বা ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে চাহিলে, চলিত কথাতেও আমরা তার "তত্ত্ব" লইয়া থাকি। যাহা জানিতে চাহি তাহা জানিতে না পারিলে, "তত্ত্ব" পাইলাম না বলি। অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমাদের কোনও বিশেষ জ্ঞানলাভেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, চলিত ভাষাতেও তাহাকেই "তত্ত্ব" বলে। আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষাতেও "তত্ত্ব" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানলাভেচ্ছার নিবৃত্তি হয়, যাহা জানিলে ধর্ম্ম কি আর ধর্ম্ম কি নহে, এ বিষয়ে আর কোনও কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্ব। সেইরূপ যাহা জানিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে আর কোনও কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানলাভেচ্ছা যাহার দ্বারা নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়, তাহাই কৃষ্ণতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের একটা ইতিহাস আছে; ধর্ম্মতত্ত্বের আছে, ব্রহ্মতত্ত্বেরও আছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যাগযজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মকেই লোকে ধর্ম্ম বলিত। এই ধর্ম্মশব্দ এখন আমরা যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, একদিন তাহার এ ব্যবহার ছিল না। আমরা এখন ইংরাজি পড়িয়া, ইংরাজের রিলিজিয়ানের কথা শুনিয়া, এই রিলিজিয়ানের প্রতিশব্দরূপেই আমাদের পুরাতন ধর্ম্মশব্দকে নিঃশঙ্কোচে ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আর বিলাতী রিলিজিয়ান একই ভাবদ্যোতক বা একই বস্তু-জ্ঞাপক শব্দ নহে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের রিলিজিয়ানের দুইটি বিভাগ

ছিল। এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞানকাণ্ড। আর এই কর্ম্মকাণ্ডের রিলিজিয়ানকেই মুখ্যভাবে আমরা ধর্ম্ম বলিতাম্। এই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বিহিত কর্ম্ম কি; আর অবিহিত কি; কোন্ যাগযজ্ঞাদি কি ভাবে করা উচিত, আর কি ভাবে করা উচিত নয়;—লোকের মনে যখন এই সন্দেহের উদয় হইল, তখনই এই ধর্ম্মবস্তু সম্বন্ধে সত্য ও প্রামাণ্য জ্ঞানলাভেচ্ছাও তাঁহাদের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান-লাভেচ্ছাকে আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'জিজ্ঞাসা' কহে। ধর্ম্মসম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হইলে, জৈমিনি মুনি পূর্ব্ব-মীমাংসায় ইহার নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। এই মীমাংসার প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। অথ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়: এক মঙ্গলাচরণ স্বরূপ, অপর সাধারণ 'অনন্তর' অর্থে। ভাষ্যকারেরা বলেন, এখানে ইহা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'অথ শব্দ' মঙ্গলাচরণার্থে এবং আনন্তর্য্যার্থে, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আনন্তর্য্যের তাৎপর্য্য কি? 'অনন্তর' বলিলেই একটা কিছুর পরে বুঝায়। সেই বস্তু বা ঘটনা কি যাহার পরে এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে? এই বস্তুটি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা সাধারণ অথচ সন্দেহ-বহুল জ্ঞান। যার কোনও জ্ঞান নাই, তার সত্যাসত্যাদি বিষয়ে মনে কোনও প্রশ্নের উদয়ও সম্ভব নহে। অজ্ঞাতের জিজ্ঞাসা অসম্ভব। জিজ্ঞাসা অর্থ জানিবার ইচ্ছা। আর জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের কোনও ইচ্ছার উদয় হয় না, হইতেই পারে না। সর্ব্বথাই "জ্ঞানাজ্জন্য ভবেৎ ইচ্ছা"—জ্ঞান হইতেই ইচ্ছার জন্ম হয়। যেমন একান্ত অজ্ঞাত বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা জাগিতেই পারে না; সেইরূপ যাহাকে নিঃশেষে জানিয়া ফেলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধেও কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যে বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান নাই; যাহার সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাহা হইতেই যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, তার নিঃশেষ উত্তর পাইবার মতন জ্ঞানলাভ এখনও হয় নাই, কেবল তাহারই সম্বন্ধে সত্য জিজ্ঞা-

সার উদয় হইতে পারে। বেদোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের একটা সাধারণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু বেদে যাহাকে বিহিত কর্ম্ম বলিয়াছে, সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, তাহার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা স্থির জানা যায় না; এই ভাবটি যখন সমাজের লোকের মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল, তখনই প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই "ধর্ম্মজিজ্ঞাসার" উদয় হয়। জৈমিনি মুনি এই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্যই পূর্ব্বমীমাংসা রচনা করেন। উত্তর-মীমাংসা বা বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রেরও প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। এখানেও 'অথ' শব্দ মঙ্গলাচরণরূপে ও আনন্তর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানেও ব্রহ্মবস্তু কি আর কি নয়, এ বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান; সেই জ্ঞান হইতেই বিবিধ সন্দেহের উদয়; সে সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য যতটুকু জানা আছে, তাহা যথেষ্ট নহে এই ধারণা; এই 'অথ' শব্দের দ্বারা এই গুলিই সূচিত হইতেছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, অথচ জৈমিনি যাহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়া-ছেন, তাহার উদয় হইল, ইহা অসম্ভব। এই কর্ম্মকাণ্ডের যতটুকু জানা আছে তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা, বিহিত-অবিহিত, প্রভৃতি বিষয়ে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই, অথচ এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল, ইহাও অসম্ভব। জৈমিনি স্বয়ংই এসকল স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মীমাংসার প্রথম কথাই "শাস্ত্র"—অর্থাৎ বেদের অস্তিত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং বেদ কি বলে, আর কি বলে না, তার সাধারণ জ্ঞান। জৈমিনি মীমাংসার দ্বিতীয় কথা—"সন্দেহ"। অর্থাৎ বেদবাক্যের অর্থসম্বন্ধে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, এই দ্বিধা। বেদ যে মানেনা, বেদের সত্যাসত্য লইয়া সে মাথা ঘামাইবে কেন? বেদ যে পড়ে নাই, বেদের মধ্যে যে নানার্থদ্যোতক পরস্পর-বিরোধী উপদেশ আছে, ইহাই বা সে জানিবে কিসে? এই জ্ঞান যার নাই, বেদসম্বন্ধে তাহার অন্তরে কোনও সন্দেহেরই বা উদয় হইবে কেন? এইরূপ সন্দেহ না জাগিলে, তার নিবৃত্তির জন্য

বেদোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছাই বা জন্মিবে কিরূপে? জৈমিনি যাহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে এতগুলি বিষয় রহিয়াছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পশ্চাতেও আমাদের দেশের উপনিষদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চার এইরূপ একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া আছে। উপনিষদে ব্রহ্মের কথা আছে। উপনিষদ বেদের অঙ্গ বলিয়া বেদেরই মতন প্রামাণ্য। এই উপনিষদে ব্রহ্মসম্বন্ধে নানা উপদেশ আছে। এই সকল উপদেশের মধ্যে আপাততঃ বিস্তর অনৈক্য এবং বিরোধও দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা উপনিষদ আত্মার, কোথাও বা প্রাণের, কোথাও বা ইন্দ্রের উপাসনা পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও বা ব্রহ্মকে অদ্বৈত, কোথাও বা দ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এসকল পরস্পর বিরোধী কথা হইতে উপনিষদ সত্য সত্য কি উপদেশ দেন, এই বিষয়ে লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহের মুখেই বাদরায়ণোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। সকল জিজ্ঞাসার পশ্চাতেই এইরূপ একটা পূর্ব্ব-ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাসটি ধরিয়াই তত্তৎ জিজ্ঞাসার আলোচনা করিতে হয়।

আমাদের পুরাতন শাস্ত্রসাহিত্যে যেমন এই জানিবার ইচ্ছাকে 'জিজ্ঞাসা' বলে, সেইরূপ যাহার দ্বারা এই ইচ্ছার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, তাহাকেই 'তত্ত্ব' বলে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্ব। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। সেইরূপ কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাকেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব বলা যায়। এই কৃষ্ণতত্ত্বের পশ্চাতে একটা কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা থাকা চাই। এই জিজ্ঞাসা হইতেই এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর এই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার পশ্চাতেও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস অবশ্যই আছে। খামাখা জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জিজ্ঞাসা না জাগিলে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না। অনুসন্ধান ব্যতীত তত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না।

পুরাতন শাস্ত্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাই; কিন্তু কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার ত কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মতন প্রকাশ্যভাবে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা নামে কোনও বিশিষ্ট তত্ত্বজিজ্ঞাসার উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না, ইহা সত্য; কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে বহুদিন হইতেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। এই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা পুরাতন ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই অন্তর্ভূত হইয়া আছে। এদেশের বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিগূঢ়ভাবে কৃষ্ণতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র, ভারতের প্রাচীন দর্শনসকলের মধ্যে যাহা উত্তরমীমাংসা নামে পরিচিত, এবং ভগবদ্গীতা, এই তিনই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণ্য শাস্ত্র। এই প্রস্থান-ত্রয়ের আশ্রয়েই আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ সাধন ও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিনখানাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র। এই ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ—"নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।"

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥

শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন যে মানুষ যদি কখনও এই আকাশকে চামড়ার মত গুটাইয়া আপনার মুষ্টিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ এমন অঘটন যদি কদাপি ঘটে, তবে তখন দেবতাকে—অর্থাৎ অন্তরের শ্রেষ্ঠ আকাশে—পরম-ব্যোমে—যিনি দীপ্তি পাইতেছেন, সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে না জানিয়া জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, তার আগে নহে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা এই তিনখানিই ভারতের এই মুক্তিশাস্ত্রের ভিত্তি। ভারতের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও সাধনই এই প্রস্থানত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তিনখানাই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল ও আদি

শাস্ত্র। আর এই তিনখানাই কৃষ্ণজিজ্ঞাসারও মূল। উপনিষদ হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। বেদান্তসূত্র উপনিষদের বিবিধ উপদেশের সমন্বয় করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপনিষদ হইতে যেমন প্রথমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা হইতেই মূল কৃষ্ণজিজ্ঞাসার উদয় হয়। মূল বলিতেছি এই জন্য যে শ্রীকৃষ্ণের নামের সঙ্গে সেখানে এই জিজ্ঞাসা জড়িত হয় নাই। বেদান্তসূত্র, সর্ব্বোপনিষদের সমন্বয় করিয়া, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে জগতের জন্ম-আদির মূলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভগবান্ ভাষ্যকরের কথায়,—"সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেন এতস্য অর্থস্য সমনুগতানি।" সকল বেদান্তে (অর্থাৎ উপনিষদে) বাক্যসকল তাৎপর্য্যের দ্বারা একবাক্য হইয়া এই অর্থেরই অনুগমন করে। "এই অর্থ"—এখানে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতেছে। বুঝিলাম বা মানিলাম যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ মাত্র পাইলাম। স্বরূপের সন্ধান ত পাইলাম না। আর তটস্থলক্ষণার দ্বারা যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতেও ত সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইল না। ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা; কিন্তু এই সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কিরূপ? তিনি জগৎ-কারণ। কিন্তু কারণ বলিতে আমরা দুইটি ভাব বুঝি। বস্তুর উৎপত্তির কারণ দুই, এক উপাদান, অপর নিমিত্ত। ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। কুণ্ডলবলয়াদির উপাদান কারণ সোনা, নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার। ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ? বেদান্ত হইতেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দু'ই। কিন্তু এখানে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর এবং জটিল জিজ্ঞাসারই উদয় হয়। এই জগতে দুইটি বস্তু দেখিতে পাই। আমাদের

অভিজ্ঞতার অগণ্য বিষয়সমূহ এই দুই বস্তুতে নিঃশেষে বিভক্ত হইতে পারে। এক জড়, অপর চৈতন্য। জড়-চেতনের সমষ্টিকেই আমরা জগৎ বলিয়া জানি। আর এই জগতে জড়কেই সচরাচর আমরা বস্তুর উপাদানকারণ, আর চৈতন্যকে তার নিমিত্তকারণ রূপে প্রত্যক্ষ করি। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, দু'ই হন, তাহা হইলে, তিনিও জড়-চেতনময় হইয়া পড়েন না কি? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করি কিরূপে? ব্রহ্ম-সূত্র বা উত্তরমীমাংসা যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল প্রশ্ন উঠে। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই-য়াই এই ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যও রচিত হইয়া, নানা তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় আজিকালি আমরা কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে চলিয়াছি, এই সকল জিজ্ঞাসার মধ্যেই তাহা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়া আছে।

উপনিষদ্ যে ব্রহ্মের উপদেশ করেন, বেদান্তসূত্র বা উত্তর-মীমাংসা যে ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? সাধন কি? সেই ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের ও জীবের সম্বন্ধ কি রূপ? সেই ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? বেদান্ত এবং বেদান্তসূত্র দু'য়েতেই এ সকল জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বেদান্তসূত্রে যে ব্রহ্মমীমাংসা হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় না। হইলে ভগবদ্গীতায় আবার এই সকল তত্ত্বের সমন্বয়ের চেষ্টা হইত না, তার কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। আর বেদান্তসূত্রেরও বহুবিধ সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হইত না। অন্যদিকে গীতা এই সকল প্রশ্নের সমন্বয় করিতে যাইয়াই, আবার একটা অতি বিরাট 'জিজ্ঞাসা' জাগাইয়াছেন। গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ কে? গীতাই এই প্রশ্ন জাগাইয়া দেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।

আমিই, হে গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতান্তর্যামী আত্মবস্তু; আমিই ভূত সকলের আদি, মধ্য এবং অন্ত। উপনিষদ "যতোবা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—"যাহা হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়" বলিয়া যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। উপনিষদে বিশেষভাবে ব্রহ্মকে অব্যক্ত, অক্ষর, বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য আবার এই উপনিষদেই এই ব্রহ্মকে "আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—জীবের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় আত্মবস্তুও বলিয়াছেন। "শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে জীবের অহংপ্রত্যয়বাচক আত্মবস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্মের জগদাতীত ও জগদ্ব্যাপ্ত দুই ভাবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একদিকে যেমন উপনিষদের কতকগুলি উপদেশ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেইরূপ আবার অন্য শ্রুতিসকল এই ব্রহ্মকেই সগুণও বলিয়াছেন। এসকলই সত্য। আর এইরূপ নানা সিদ্ধান্তের ও নানা মতবাদের কথা উপনিষদে আছে বলিয়াই, এসকলের যথাযোগ্য সমন্বয় ও সঙ্গতি করিয়া, উপনিষদ্ কোন্ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ঠিক করিবার জন্য উত্তরমীমাংসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু গীতাতে এমন কিছু কিছু পাওয়া যায়, যাহা ঠিক উপনিষদে বা ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টতঃ পাওয়া যায় না। প্রথম কথা অবতারবাদ। এই অবতারবাদ গীতার নিজস্ব বস্তু। উপনিষদেও ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন সংবাদে ইন্দ্র আপনাকেই পরম-উপাস্য ও পরমগতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সত্য। বেদান্তসূত্র—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশ বামদেববৎ" —বেদে বামদেব ঋষি যেমন ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মনু ছিলাম", "আমি সূর্য্য হইয়াছি", এখানে কৈবিতকী-

ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন সংবাদে, ইন্দ্রও সেইরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন—"মামেব বিজানিহি", "মামুপাস্ব"—'আমাকেই জানিতে চেষ্টা কর,' 'আমারই উপাসনা কর,'—এ সকল কথা কহিয়াছেন ;—এই বলিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই নিজেকে ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেখানে কেহ কেহ এই ভাবেই তাঁর উক্তির অর্থ গ্রহণ করিতে বলেন, ইহাও জানি। কিন্তু "শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশ বামদেববৎ" সূত্র অবলম্বনে গীতার সকল কথার মীমাংসা হয় না। আর গীতার মূল কথা এই কৃষ্ণ-কথা। একটু তলাইয়া দেখিলেই, গীতাতেই যে সত্যভাবে কৃষ্ণজিজ্ঞাসার সূচনা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণতত্ত্বকে ছাড়িয়া, গীতার জ্ঞানযোগই বলি, কর্ম্মযোগই বলি, আর ভক্তিযোগই বলি, এ সকলের কিছুরই সন্তোষকর মীমাংসা হয় না। এই তত্ত্ব উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের বিরোধী নহে, একান্ত অতিরিক্তও নহে। কেবল উপনিষদে যাহা বীজরূপে আছে এখানে তাহাই অঙ্কুরিত।

কৃষ্ণজিজ্ঞাসার ইতিহাস খুঁজিতে যাইয়া সকলের আগে, এইজন্য, আমাদিগকে ভগবদ্গীতার আলোচনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অন্তর্যামী

১।

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথখানি মোর কাছে অতিশয়!
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত,
মন-উপবনে মোর ঘুরিছি সতত!
তবু পথ নাহি মিলে দিশাহারা মন,
রূপ-রস-গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে ছিন্ন ফুলহার—
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার!
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত!

২।

পথের লাগিয়া মন মন-পথবাসী
আমি ত আমাতে নাই শুধু কাঁদি হাসি!
গৃহহীন একা যেন স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথে পুনঃ স্বপ্ন যায় টুটি!
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে
আকুল নয়নে, কার অশ্রুজল ঝরে!
সে যে আমি সে যে আমি, আমি সে পাগল!
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল!
মন-মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই!

৩।

সব তার ছিঁড়ে গেছে, একখানি তার
প্রাণ-মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে একটি আশায়,
ভূলুণ্ঠিত প্রাণ-লতা আকাশে দোলায়!—
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার,
এক সুরে প্রাণ-মাঝে কাঁদে বার বার!
সব কর্ম্মশেষে আজ মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথবাসী
সেই পথ খানি মোর গয়া-গঙ্গা-কাশী!

৪।

সে পথের হইতাম ধূলি-কণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
বুকে বুকে থাকিতাম
কভু নাহি ছাড়িতাম
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি
মিশে মিশে হইতাম পদরজ-রাজি,—
আঁকড়িয়া থাকিতাম
মিশে মিশে হইতাম
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি!

৫।

ধূলায় ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলি হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায়!

কিছুতে না ছাড়িতাম
জেগে লেগে রহিতাম
সেই পথ-পথিকের চরণ তলায়!
এক দিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির-সোপানে!
কি গান যে গাহিতাম
হাসিতাম কাঁদিতাম
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির-সোপানে!

৬।

কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল
আমি মত্ত দিশাহারা
দীন কাঙ্গালের পারা
একটি আশার আশে পথের পাগল!
নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল,
সব অঙ্গ জর জর শিথিল বিকল,
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!—
বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগালেরে আর তুমি কর'না পাগল!

নারায়ণ

২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২২

গান

কেন ডাকো এমন করে
ওগো আমার প্রাণের হরি,
কেমন করে যাবো বল,
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি!
প্রথম ডাক বিহান বেলা
শয়ন ছেড়ে চম্‌কে উঠি,
সারা রাতের শিশির ধোওয়া
ফুলের মত থাকি ফুটি।
আবার ডাকো দুপুর বেলা
বিজন আমার আঁধার ঘরে,
পেতে পেতে পাইনা তাই—
হৃদয় ছাপি নয়ন ঝরে।
আবার ডাকো সাঁঝের বেলা
করুণ তব গগনতলে,
পরাণ বেয়ে কি জানি গো
চোখের কোণে ছল ছলে!

আবার ডাকো আবার ডাকো
গভীর ঘন আঁধার রাতে,
হৃদয়-ভরা করুণ ব্যথা
উছ্‌লে উঠে আঁখির পাতে।
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার পাগল-করা!
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার সকল-হরা!
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার পাগল হরি!
কেমন করে যাবো বল
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি!

কীর্ত্তন

ওগো আমার উজ্জল-বরণ!
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
আমার মেঘ কাটে না হে!
মনের মাঝে ওই সেজেছে,
কাটে না হে, কাটে না হে!
আমি চেয়ে আছি, তোমার পানে
সারা বেলা সকল কাজে!
তবু মেঘ কাটে না হে!
চোখের জলে, চেয়ে আছি,
তবু দেখ্‌তে পাই না হে!
ওগো আমার উজ্জল-বরণ!
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
আমার কানের কাছে বাজে হে!
আমার প্রাণের মাঝে বাজে হে!
সকল কাজে সারা বেলা
মনের মাঝে বাজে হে!
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
ওগো আমার সোহাগ-রতন!
ওই যে তব নূপুর বাজে!
আমি দেখ্‌তে নারি শুনতে পাই
ওই যে তব নূপুর বাজে!

ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে !
ওগো আমার সোহাগ-রতন !
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
ওগো আমার উজল-বরণ !
একবার তবে দেখা দাও !
আমার মনের মেঘ থাক্‌বে না হে !
ভেসে যাবে, থাক্‌বে না হে !
ওগো আমার সোহাগ-রতন !
একবার তবে দেখা দাও !—
আমি সোহাগভরে ডাক্‌ছি কত,
একবার তবে দেখা দাও !
একবার তবে বঁধু বঁধু হে !—
দাঁড়াও এসে চোখের কাছে।
বঁধু বঁধু হে, বঁধু বঁধু হে !
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে নূপুর বাজে !
একবার তবে বঁধু বঁধু হে !
দাঁড়াও তুমি চোখের কাছে।
ওই যে তোমার গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল বনের মাঝে !—
আমার মনের মাঝে হে !
আমার মন-বনের মাঝে।
বঁধু বঁধু হে ! বঁধু বঁধু হে !
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।

একবার দেখি বঁধু বঁধু হে !
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে !

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৬]

হীনযান ও মহাযান।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কি? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাৎ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাৎই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোন যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোট। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল,—(১) প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর (২) শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোন বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার কোন সুবিধা নাই, তখনও লোকে আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেকদিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান। ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইহাঁদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্ব্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্ম্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর পর জন্মে ধার্ম্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'অবলোকিতেশ্বর' উদ্ধার হন হন,—মহাশূন্যে বিলীন হন হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্ব্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ত্ব পাইলেই খুসী, মহাযান তাহাতে খুসী নয়,—

তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাৎ কি? অর্হৎও নির্ব্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্ব্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থগাছের তলায় সম্যক সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্ব্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কি হইবে? মগধ যে অধর্ম্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাই তিনি কাহারও মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারও মতে একচল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করেন ও আশী বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, একি? বুদ্ধ ত এধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও ত এসকল কথা বলে না। এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কি করিয়াছিলেন? তিনি ত মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা ত তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাঁহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি

কখনও হয়,—'পরার্থে' কি উপদেশ হয়? উপদেশটা "স্বার্থে"ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল? আমি ত তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই ত 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কি জাঁক করিতেছ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশই' হইল। তুমি ত আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না? তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখ। তুমি ত আর তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার কর। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি' তুমি কি করিয়া পাইলে? যাহার চেয়ে আর বড় সম্বোধি নাই, সেই সর্ব্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই?

আর এক কথা;—তুমি ত বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত; তোমার শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা ত সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে? তোমাদের শ্রাবকযান ত কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ,—তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না,—কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে? তোমরা মহাযানের মর্ম্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় ত কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশও ত বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ত্ব না হইলে ত একেবারে বুদ্ধ হইবার যো নাই। একথা ত তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ; তাহার উপদেশও অতি উচ্চ; তাহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ; তাহার জন্য যে সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কি? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও,—তোমরা ত তিন জন্মেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন বুঝিয়া দেখ দেখি, তোমরা 'হীন' কি না? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়, আমরা বুদ্ধ হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়,—আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ,—আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব,—এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না,—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখ দেখি, আমাদের যান মহাযান কি না? দেখ দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাৎ?

শ্রাবকযান বলিতেছেন;—তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়ই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' ত থাকা চাই, 'বিনয়ে' ত থাকা চাই, 'অভিধর্ম্মে'ও ত থাকা চাই। এই লইয়াই ত 'ত্রিপিটক'।

ত্রিপিটকের বাহিরে ত বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা ত বলিয়া বেড়াও কোন ধর্ম্মেরই 'সত্তা' নাই,—'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে ত সবই অভাব,—সবই শূন্য। এ সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন;—কেন আমাদের ত শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই ত সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরও কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও,—বোধিসত্বের বিনয়—সে অতি বড়। বিনয়ের উদ্দেশ্য ত ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা কিছু চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি,—সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্ব্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটখাট কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্ম্মের কথা বলিতেছ,—অভিধর্ম্ম ত ধর্ম্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম্ম 'অনুত্তর-সম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন, তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ। এ ছুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরও তিন,—স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি, বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর ছুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে ছুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি

হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর একটা বড় জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোষ করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দ্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোষ করিয়া কেবল ধর্ম্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড় একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড় বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর একরূপ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন,—ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধি-চিত্তোৎপাদ'। 'বোধিচিত্তোৎপাদের' পর আর দুইটি কথা শুনিতে পাই,—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা', অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড় গোলযোগ আছে; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীল-পারমিতা' কি করিয়া হইবে? 'শীল' ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বল বৌদ্ধপণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু আর এক ব্যাখ্যাও আছে,—মিশ্র-ভাষার পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়,—পরমের ভাব,—সর্ব্বোৎ-

কৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা শীলপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দুবার ভাব প্রত্যয় হয়,—তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ দু'চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়ই তফাৎ দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব"। বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনাআপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন—তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, —নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না,—চুপ করিয়া থাক। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড় বেশী। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশী কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে আর একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন'

'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এসকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশবোধি সত্ত্বভূমি' অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্ব্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্য্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতাই' আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা সকল পারমিতানামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে সত্য দুই প্রকার,—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য,—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারিদিকে যেসকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না ; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ

সত্য কখনই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমনের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নহে, ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়,—তিনি একটি 'মানুষী' বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে। এখনকার মহাযানেরা বলেন যে হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্রকলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর একজন বড় 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে স্বয়ম্ভুচৈত্যের চারিদিকে এই পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়"? আমার সঙ্গে যে বজ্রাচার্য্য ছিলেন তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বে নীচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম্ম মহাযানে বড়। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধের

কি সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সঙ্ঘ বলিতে গেলে একবিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহা-দিগকে বুঝায়; কিন্তু উহারা বলে সঙ্ঘ ক্রমে বোধিসত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ব। ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝান কঠিন নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম্ম যদি জ্ঞান হইলেন তবে বুদ্ধ কি হইলেন? তিনি হইলেন,—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা ত আর সঙ্ঘ হইতে পারেন না, তখন সঙ্ঘ আর একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সঙ্ঘ হইলেন,—বোধিসত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্ব্বময় সর্ব্ব-নিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড় বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোট মনে করিতেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কবি সুরেন্দ্রনাথের নাম এখনকার সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত কি না, তাহা সংশয়ের কথা। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার 'মহিলা' পড়িয়াছেন, তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তি যে কেমন ও কতটা ছিল, তাহা অবগত আছেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁর কাব্য আছে। আমি সেই কাব্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জীবন-কথার আলোচনা করিব এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব তিনি কিরূপ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে, কি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠাসহকারে বাণীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরবনদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ বঙ্গাব্দে, ভট্টনারায়ণের বংশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাই অতি শৈশবে তাঁর শিক্ষার কোনওরূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। পরে জনৈক আত্মীয়ের অনুকম্পায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ ইনিষ্টিটিউষণে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং পরে সেখান হইতে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বেশী দিন তিনি এখানে পড়াশুনা করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, ১২৬৩ সালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার উনিশ মাত্র। এরূপ শুনা যায় তাঁর একমাত্র প্রতিপালক জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের মৃত্যুই ইহার কারণ। কিন্তু কোনও দিনই বোধ হয় স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকাদি পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইত না। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রুচিমত যখন যে বই পাইতেন তাহাই পড়িতেন। এই ভাবেই তিনি নিজে স্বাধীনভাবেই আপনার জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সকলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা স্ফুরিত হইতে আরম্ভ করে। সেকালে যশোহরের আর একজন "মজুমদার"-কবির যশোভাতি বাঙ্গলা সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 'সদ্ভাবশতক' মোহম্মদীয় আদর্শের ভক্তিগ্রন্থ। ইহার অনেকগুলি কবিতাই হাফেজের কবিতা অবলম্বনে রচিত। স্বভাব-বর্ণনা ও ভগবদ্-মহিমাকীর্ত্তনই সেকালের বাঙ্গলা কবিতার বিশেষত্ব ছিল। সুরেন্দ্রনাথও বাল্য-জীবনে এই আদর্শেরই অনুকরণ করেন। ইহাই তাঁর 'ষড়-ঋতু-বর্ণন' নামক গ্রন্থে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময়ে 'উষা' এবং 'স্বপ্ন' নামে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হয়। এগুলিতেও নবীন কবির মার্জ্জিত রুচি ও গভীর রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্কুল ছাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বিদেশে চলিয়া যান। এই সময়ে "মঙ্গল উষা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কবিতা ও গদ্য সন্দর্ভ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর যে সকল কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার প্রতিভার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই লেখার মধ্যে তাঁর "কবি-প্রশংসা" একটি অতি সুন্দর রচনা। ইহা হইতে কয়েকটি পদ্য এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

"সুন্দর এ সৃষ্টি বিধি করি সম্পাদন,
ভাবিলেন শোভাবোধ করে কোন্ জন।
যেমনি এ চিন্তা তাঁর মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল।
বাগ্‌বাণী সযতনে অঙ্কেতে তুলিয়া
পালিলেন সে সন্তানে স্তনসুধা দিয়া।

কল্পনা দর্পণ দেবী দান দেন তায়,
সমুদয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব যায়।
স্থাপিলেন আনি পুত্র সংসার ভিতর
নরকুল গুরু যিনি, কবি নাম-ধর।
যাহার কোমল গীত লোলস্বরভরে
বাণীস্তন পীত সুধা বাক্যসহ ঝরে।

*　　*　　*　　*

কবি বিনা কে করিত মহত্বস্থাপন
কাব্যকল্পতরু কেবা করিত রোপণ ?

*　　*　　*　　*

যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়,
গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোরস্বরে,
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ সাগরে,
যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে
কবি-যশে রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে।”

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া, প্রখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে নিজের জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত করেন। জমীদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম কিরূপ তাহা সকলেই জানেন। এরূপ কাজের মধ্যে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা বা জ্ঞানানুশীলন করা যে কত কঠিন, ইহাও আমরা বুঝি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই অবস্থাতেও সাহিত্য-সেবাতে শিথিলযত্ন হয়েন নাই। এই সময়ে তিনি ভারবীর “কিরাতার্জ্জুনীয়ের”, ইংরাজ-কবি গোল্ড্‌স্মিথের “ট্র্যাভেলারের” এবং আইরিশ কবি মুইরের “আইরিশ মেলডিকার” অনেকগুলি স্তবক হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গলা ছন্দে ভাষান্তরিত করেন।

মধ্যবয়সে কবির কিঞ্চিৎ পানদোষ ঘটিয়াছিল, এইজন্ত অনেকে বলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইতেছিলেন, কবিও এই পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া "মাদকমঙ্গল" শীর্ষক কাব্য লিখিয়া আপনার অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়াছেন। ইহার কিছু-কাল পরে তিনি 'সবিতাসুদর্শন' ও 'ফুল্লরা' নামে দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এই দুইখানি কাব্য মুদ্রিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ যশঃপ্রার্থী ছিলেন না। কেবল আপনার তৃপ্তির জন্যই হৃদয়নিহিত কবিত্ব-শক্তির প্রেরণায় কাব্য লিখিতেন; যশের পথ মুক্ত করিবার জন্য নহে, কেবল "শিবেতর ক্ষতয়ে"। কিন্তু তাঁহার জনৈক আত্মীয় "সবিতাসুদর্শনের" অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া লুকাইয়া উহা মুদ্রিত করেন; কিন্তু ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া সুরেন্দ্র-নাথ বিরক্তিপ্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, সুরেন্দ্রনাথের আদেশমত "জনৈক অজ্ঞাত মৃত কবি" কর্ত্তৃক রচিত এই নামে প্রকাশিত হয়।

কোনও কোনও সমালোচক বলেন,—সুরেন্দ্রনাথের "ফুল্লরা" কাব্যে ভাবগাম্ভীর্য্য থাকিলেও ভাষালালিত্য নাই, এইজন্য ইহা উচ্চ-শ্রেণীর কাব্য হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার "সবিতাসুদর্শন" সম্বন্ধে এ কথা একেবারেই প্রযোজ্য নহে। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে ভাষার ঝঙ্কারের সহিত গভীর ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার যাথার্থ্য বিচারের জন্য এই গ্রন্থখানির বিশদ আলোচনা করিব।

একদিন যখন সন্ধ্যার ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, যখন পশ্চিম আকাশে ঈষৎ রক্ত আভা রাখিয়া দিবাকর অস্তাচলে প্রস্থানপর হইয়াছেন, তখন পুণ্য বারাণসী ধামের গঙ্গাতীরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজানিরত রহিয়াছেন—

"বৃদ্ধ বয়ঃ, হেমন্তের তুষার পতনে
ধবলিত বটে তার শির;

তবু যেন জ্যোতিস্তরে জ্বলে দু'নয়নে
যৌবনের নিদাঘ মিহির।

* * * * *

"গম্ভীর বদন—নয় গর্ব্বের আধার—
কোমল করুণা তায় বসি;
গত মোহ-ঘন, ক্ষণ-হর্ষ চপলার
মুক্ত মুখ—সন্তোষের শশী।"

এই দুই ছত্র হইতে আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সমগ্র চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারি—পুণ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ তাঁহার সমস্ত অবয়ব যৌবনের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আর তাঁহার হৃদয়ের কারুণ্য তাঁহার প্রশস্ত বদনে একটা কমনীয়তা আনিয়া দিয়াছে। পবিত্র মণিকর্ণিকার অবতরণিকার উপর উপবেশন করিয়া ধীর অস্তগামী ভানুর উদ্দেশে বলিতেছেন—

"যাও অন্যলোকে গিয়া জাগাও জীবন,
হাসাও সলিলে নলিনীরে।

* * * * *

"হেসে হৈমবতী ঊষা ডাকিছে তোমায়,
হেসে তুমি চলিতেছ তায়,
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়,
ছায়া-সতী সপত্নী ঈর্ষায়।
"অসীম আকাশক্ষেত্রে বালক-ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল-ভ্রমণ;
রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়
পরশিত কাঞ্চন চরণ।

"এলো চুলে, হেলে দুলে মিলে করে করে
আগে আগে নাচে হোরাগণ ;
একচক্র রথ চলে, চলে তার পরে—
পরে পরে ঋতু ছয় জন।"

কবি কেমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ছন্দে প্রাকৃতিক তথ্যগুলি বর্ণন করিয়াছেন ; তারপর অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি ব্রাহ্মণের সেই আবেগময়ী জিজ্ঞাসা কি মর্ম্মস্পৃক্—

"ক্ষীণ—ক্ষীণতর ভানু! বিলীন এখন!—
বুঝালে কি ভ্রান্তমতি নরে ?
তেজস্বী হলেও চিরপ্রভাব কখন
কারুই না রয় ধরা পরে!"

যখন তিনি এইরূপ কবিতাস্রোতে নিমগ্ন, তখন এক তরুণ যুবা আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। সেই যুবকের মাতৃপিতৃহীনতার কথা শুনিয়া তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত উন্নত ললাট চিন্তারেখাক্লিষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া পড়িলেন—"সুকোমল দ্বিজবর-হৃদয়-কমলে করুণার মধু উপজিল" ; তখন যুবক সুদর্শন ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যা সবিতার সোদরস্থান অধিকার করিল। অপূর্ব্ব মেধাবী সুদর্শন গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে সকল বিদ্যায় সাফল্য লাভ করিতে লাগিল, অবসর সময়ে বালিকা সবিতার সহিত কুসুমচয়ন, মাল্যগ্রথন, সুখাদ্যরন্ধন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এইরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়াসমূহের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া কিশোরী সবিতা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল। এই স্থলে কবি সৌন্দর্য্যের যে মধুর বর্ণন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক সুরটুকু চিত্তগ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী, বাহুল্য-ভয়ে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম না। কবির বর্ণনা-কৌশল উপভোগ করিতে করিতে আমরা কবির একটি কৃতিত্বের পরিচয় পাই

—কবি দেখাইয়াছেন, যুবক সুদর্শন সবিতার হৃদয়ভরা প্রেম পাইয়াও বিষণ্ণ, নিঃস্পৃহ; তাঁহার বদনের কান্তিময় আভার উপর একটা ঘনচ্ছায়া পড়িয়াছে, আর সকল সময়েই সে ক্লিষ্টমনে কেবলই চিন্তারত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে যুবকের আত্ম-পরিচয়ে সত্যের কিছু অপলাপ ঘটিয়াছে। তারপর যখন সুদর্শন আচার্য্যের নিকট নিজের কথা বিবৃত করিল, যখন শুনিলাম সে অনাথ ব্রাহ্মণকুমার নহে, সে দিল্লীর বাদশাহ আক্‌বর সাহার লিপিকার আবুলফাজলের ভ্রাতা ফৈজী, তখন বুঝিলাম আমাদিগকে প্রকৃত তথ্যে উপনীত করিবার জন্যই কবি আমাদিগের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিলেন। যুবকের এই পরিচয় শুনিয়া সবিতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। ব্রাহ্মণ ফৈজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ক্ষুদ্র বিবরণটির মধ্যে কবি বর্ণনা-পারিপাট্যের সহিত মনোজ্ঞ চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মণের দয়া, তিতিক্ষা, সকল রকম দুঃখশোকে উপেক্ষা; আর দেখাইয়াছেন—প্রণয় কোনও জাতিবিচার মানে না, প্রণয়ীর সহিত মিলন সম্ভবপর না হইলে প্রেমিকার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে; সর্ব্বশেষে দেখাইলেন দয়া এবং প্রেমের পুণ্য আলোকের মাঝে আসিয়া মুসলমান যুবকের অহঙ্কার-তিমিরও দূর হইল, সে সত্য গোপন করিতে পারিল না, তাহারও সঙ্কীর্ণ বক্ষে একটা স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল।

'সবিতাসুদর্শন' প্রকাশিত হইবার পর হইতে কবির চিত্ত ধর্ম্মের বিমল আলোকে আকৃষ্ট হয়; পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্রে যে দুই একটি ক্ষুদ্র কলঙ্ক লক্ষিত হইত, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের মধুর কিরণপাতে অপসারিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে যে ভগবৎপ্রেমের রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিত, তাহাতে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন, কবি গভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। অনেকেই জানেন যে, সুরেন্দ্রনাথ শেষজীবনে কবি ও সাধক হইয়াছিলেন। স্নিগ্ধ

কর্ম্ম তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইল, তিনি নির্জ্জনতা উপভোগ করিবার জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশই তাঁহার সর্ব্বসমাদৃত 'মহিলা'-কাব্যের জন্মভূমি। সুরেন্দ্রনাথের প্রায় সকল কবিতাই প্রেমমাখা, কিন্তু এই সময়ে শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি তাঁহার প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, "মহিলা"র ইহার পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। কবির হৃদয়ে যে প্রেমভক্তির তটিনী বহিতেছিল, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন বর্ষার আবেগময়ী তটিনীর ন্যায় 'মহিলা'-কাব্যে দুই কূল উপ্‌চাইয়া ছুটিয়াছে। কবির 'মহিলা'-কাব্যই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে যশস্বী করিয়া রাখিয়াছে, সেই নিমিত্তই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কথা বিবৃত করিবার পূর্ব্বেই উহার সম্যক্‌ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

'মহিলা'-কাব্যের অবতরণিকায় কবি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়াছেন,—নীলকোকনদশোভিত সরোবর তাঁহার বর্ণনার বস্তু নহে, সুরভি-কুসুমবাসিত কলতানও তিনি শুনাইতে আসেন নাই; তাঁহার আখ্যান বস্তু একেবারে সতন্ত্র, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

> "গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার
> মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

আবার কোনও বিশেষ বরবর্ণিনী নায়িকার চাটুস্তুতি রচিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই; মাতা, জায়া, ভগিনীর চির উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের গীত গানই কবির উদ্দেশ্য।—জগতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া মানব ধরার শ্যামকান্তি নিরীক্ষণ করিল, চরাচর বিমল আলোকে পুলকিত দেখিল, মৃদুল সমীরে আন্দোলিত পুষ্পনিচয়ে ভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জন শুনিল, তথাপি তাঁহার অন্তরে সুখ নাই; কিসের দুঃখ তাহা সে বুঝিতে পারে না, তথাপি শোভাময় জগৎ তাঁহার নয়নে শূন্য, যেন চিরদুঃখের বেষ্টনী দিয়া আবৃত; মানবের এই ক্লিষ্ট ভাব দেখিয়া বিধাতা ভূলোক পুলকপূর্ণ করিয়া ললনার সৃষ্টি করিলেন। এক নারী নানারূপে সংসারের সমুদয় সুখ বিরচিত করে,—জননীর

পুষ্টি, ভগিনীর প্রিয়চিন্তা, কন্যার সেবা, জায়ার প্রেম, সকলই নরের সুখকর ও কল্যাণদায়ক। রমণীই পুরুষের চিত্তে স্বদেশ-প্রেম জাগাইয়া দেয়, নারীই পুরুষের হৃদয়ে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আনিয়া দেয়, আর ললনাই মর্ত্ত্যনিবাস স্বর্গে পরিণত করে। তাই কবি 'মহিলা' গ্রন্থতে গাহিতেছেন—

"নারীমুখ সংসারের সুষমার সার,
শ্রেষ্ঠগতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন।
নারী বাক্য গীত জানি,
নারী কার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার!
মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে ললনার!"

কবি এই আত্মনিবেদনের পর প্রথমে মাতৃমূর্ত্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছেন—কবি প্রথমেই বলিয়াছেন যে মাতার মহিমা অবর্ণনীয়—

"নিজ অঙ্গ-অংশ দিয়া
এই তনু নিরমিয়া,
চিতে হতে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়
আমায় সৃজেন যিনি
ধাতার স্বরূপ তিনি।"

এই ধাতার স্বরূপ কখনও বর্ণনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে না, কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায় জননী "সৃজিবার, পালিবার প্রতিনিধি বিধাতার"; সন্তানের জন্য জননীর ক্লেশ অবর্ণনীয়—

"কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন!
স্মৃত কান্দে কানে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,
করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ!—
ন, তবু লভি' মৃত পাশরে জীবন।"

এইস্থলে সমাজের অন্ধ কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে কবি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণ হৃদয় সূতিকাগৃহের অপকৃষ্টতায় বেদনা অনুভব করিয়াছে—ধাতার প্রতিনিধি মাতা যেস্থানে বিদ্যমান, যেস্থানে সৃষ্টির পুণ্যতম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সেস্থলকে অশুচি মনে করিয়া ভ্রান্ত নর গৃহের নিকৃষ্ট ভাগে সূতিকাগার নির্দ্দিষ্ট করে—

"রবিকর বায়ুহীন
আর্দ্রতল, শয্যাদীন,
প্রসূতি সন্ততি দোঁহে নিপতিত তায়!—
নিত্য নব নব পীড়া
কালের কৌতুক ক্রীড়া
হয় ত বা ফুলকলি ছিঁড়ে নিয়ে যায়!—
রেখে মাত্র চিরস্মৃতি শোকের কাঁটায়!!"

কিন্তু সুখের বিষয় যে করুণহৃদয় কর্ম্মবীরগণের একান্ত চেষ্টায় এক্ষণে বঙ্গসমাজ হইতে এই কুসংস্কার অপসারিত হইয়াছে; কেবল নগরে নহে, সুদূর পল্লীগ্রামেও এক্ষণে স্বাস্থ্যকর স্থানে সূতিকাগৃহ সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

যে অস্পৃশ্য নীচাচার জাতি শরীর-চিকিৎসায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞ নহে, সেই প্রসূতির একমাত্র সেবিকা; তাই কবি এই ভীষণ ভ্রান্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"তিনি ধাত্রী ষষ্ঠী দেবী, এ কোন্ বিধান!" যে শিশুর জন্মোপলক্ষে নানা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম

পদার্পণ পুন্নরক হইতে পরিত্রাণ সূচিত করে, পশুর অপ্রিয় স্থলে তাহার আবাস, আর সেই রত্নপ্রসূ জননীর তৃণশয্যা, অরুচিকর কটু দ্রব্যমাত্র ভক্ষ্য; কবির হৃদয়ে ইহাতে আঘাত লাগিয়াছে, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালী সমাজকে বলিতেছেন—

"হেন তুমি বাঙ্গালী নির্ম্মম শিলাকায়!—
'ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা' প্রমাণ তোমায়!"

এইস্থলে কবি সূতিকাগৃহের যে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সত্যই মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, ক্ষোভের উদ্রেক হয়, লজ্জার উদ্রেক হয়। এই কঠোর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; তাই আমরাও বুঝিতেছি এবং কবিও বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালী বলিষ্ঠ নও, হেতু এক তার
বলবান্ জেনো নিজ সূতিকা ব্যাপার।"

ধনীদিগের ধাত্রী রাখা পদ্ধতির বিরুদ্ধে কবি কটাক্ষপাত করিয়াছেন,—

"কেমন নির্ম্মম তারা,
জননী থাকিতে যারা,
জননী বঞ্চিয়া রাখে সন্তান আপন!—
উদাসিনী নারী আনি,
অতি হেয় কার্য্য মানি,
তারে সমর্পণ করে সন্তান পালন!—
নিজে সুতে পরিহরে,
সুতে সঁপে তার পরে;—
কিংবা সুতমৃতা বিষঘট স্তন যার;—
অথবা মমতাহীনা
চির কুক্রীড়ায় লীনা
বারাঙ্গণা—অঙ্গ যার আময় আধার!—
মানি, কাল কংসদূতী পূতনা প্রকার!"

সন্তান যাহার স্তন পান করে, যাহার সহিত বাল্যে অবস্থান করে, তাহারই প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কবি নিদর্শন স্বরূপ সুসভ্য ইংরাজ ও মিশ্র ফিরিঙ্গীর মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচারের সূক্ষ্মজাল ছিন্ন করিয়া একেবারেই বলিতেছেন—"সুশীল কি হবে হড্ডকিনী স্তনপানে?" এইজন্যই মাতাপিতার বিচ্ছেদ তাহাদের সম্ভবপর—"ধাত্রীর পালিত যারা, কেন না কহিবে তারা কিসে আমি ঋণী আছি পিতার মাতার?" তাহারা স্বর্গীয় মাতৃপ্রেমের আস্বাদ পায় না—

"সুত মাতা পরস্পরে,
প্রথমে যে প্রেম করে,
সংসারে কি আছে প্রেম কোথাও তেমন!
সদা ধ্যান এক মুখ,
একাধারে সব সুখ,
একের হইলে জ্বর, জ্বরে অন্যজন!
বিচ্ছেদে উভয় চিত
বিচলিত, বিকলিত
একের নয়ন, অন্যে ঝরে স্তনধার!
মিলনে কি সুখোদয়,
সব দুঃখ তাপ লয়,
স্বর্গসুধা ভোগ নয় সমতুল তার!
কার সনে হেন প্রেম কবে হয় আর!

এইস্থলে কবি স্নেহময়ী জননীর যে সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহার মাধুর্য্য অক্ষকে প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, নিজে তাহা বুঝিয়া হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিতে হয়।

তারপর সন্তানের শৈশবকালে তাহার চিত্ত বেলাস্থিত বেতসখণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক তটপ্লাবী তরঙ্গাঘাতেই নমিত হয়, তখন মাতার

শিক্ষাই শুভফলপ্রদ এবং সেই বাল্যের সংস্কার চিরজন্মে লুপ্ত হইবার নহে। মর্ত্ত্যের যমসভারূপ পাঠশালায় সরস্বতীকে রাক্ষসী সমান দেখিতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু মাতার শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র—

“এক বর্ষে শ্রম ভরে
যে কিছু শিখাবে পরে,
এক মাসে মাতৃবাক্যে হৃদয় তা ধরে;—
তুষিয়া শিখাবে মাতা, প্রহারিয়া পরে!”

সমাজের কল্যাণের জন্য, মানবের উন্নতির জন্য কবি স্ত্রীশিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার যদি আর কিছুমাত্র হেতু না থাকে, সন্তানের শিক্ষাই বলবান্ কারণ নহে কি? শিশু সকল সময়ে মাতার নিকট লালিত, মাতার প্রত্যেক বাক্যের সহিত সে পরিচিত। তাই জননীর স্তনপানের সহিত শিশু যে শিক্ষা পায়, তাহাই তাহাকে জীবনে মহৎ করিয়া তুলিতে সহায়তা করে; মাতার দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাই সুশিক্ষার দ্বারা মাতার সে দোষ অপসারিত না হইলে, সন্তানের জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে প্রথমেই অন্তরায় আসিয়া পড়ে। আবার হিন্দু পরিবার যে এক্ষণে এত কলহসঙ্কুল,—“কুণ্ঠিতা কমলা কাছে নাহি যান ডরে!”—তাহার কারণও শিক্ষার অভাব। কবি সেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

“গৃহী পেয়ে পরিতাপ,
বলে নারী কিবা পাপ!
রে মূঢ়! কাতর কেন থাকিতে উপায়?—
মোহ ছাড়, যত্ন কর ললনা শিক্ষায়।”

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উত্থাপিত করেন, তাঁহাদের মতের অসারতা প্রমাণ করিতে করিতে এক স্থলে কবি বলিতেছেন যে, অনেকে বলেন—

"হলে নারী বিদ্যাবতী
আর না থাকিবে সতী
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবিঃ হেন তায়!"

তাঁহারা শিক্ষাবলে অভিমানী হইয়া বাণীকেও গণিক'দলে গণ্য করেন। প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে কহে, তাহা তাঁহারা জানেন না, অথবা জানিতে চেষ্টা করেন না। নারী পিত্রালয়ে অল্পমাত্র বিদ্যালাভ করিয়া পতি-গৃহে আসিয়া কেবল বেশভূষায় রত থাকে, কারণ তথায় তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য কেহই লালায়িত নয়; সেই সময়ে দুষ্য গ্রন্থপাঠে কুপথ্য সেবনের ন্যায় কুশিক্ষা হইয়া থাকে। ইহা ত শিক্ষা নহে, শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষিতা রমণী স্বর্গের দেবী হইতে বিভিন্ন নয়; স্বভাবতঃ নারীজাতি বিবিধগুণে বিভূষিতা, ইহার উপর বিদ্যার সংযোগ ঘটিলে, অগ্নিতে কাঞ্চনের শ্যামিকা ভাগ দূর হইয়া কেবল বিশুদ্ধ ভাগ থাকিবে; সংসার স্বর্গ হইবে, শোকের আলয় শান্তি-নিকেতন হইবে, মর্ত্ত্যে নন্দনের শোভা সৃষ্ট হইবে।

বিশ্বজগতে মাতার স্তুতি গাহিয়া শেষ করা যায় না, বাণী স্বয়ং বর্ণন করিলেও সেই মহিমার সমাধান হয় না, তাই কবি গাহিতে-ছেন—

"যদি ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর জল,
শতকল্প বসি যদি পূজি তব পায়!—
সুধাকর সুধাগারে
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন।
পারিজাত দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন!
তবু না শুধিতে পারি তোমার যতন!!

অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ অপসারিত করিবার জন্য কর্ম্মবীর পুরুষগণের উত্থান হইয়াছিল, তখন কবি সুরেন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেন। বিদ্যাসাগরপ্রমুখ মহাত্মাগণ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন কবি সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা'-কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন; তাই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির স্বভাবজাত কারুণ্যের সহিত শিক্ষা সংমিশ্রিত হইলে, সমাজ উন্নত হইবে, সংসার স্বর্গ হইবে, জীবনে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে।

অতঃপর কবি প্রেমময়ী জায়ামূর্ত্তির রচনা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, প্রথমেই স্তুতিচ্ছলে বলিতেছেন—

"তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা; মধ্যা প্রগল্ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি তাবিতর্ক অণু পদার্থবিদ্যার;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতির সাংখ্যের তত্ত্বসার;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

* * * *

কুন্তলকলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দুর ললাটে জাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্র-পল্লব-ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায়!"

জায়াই জীবনের সর্ব্বসুখনিয়ন্ত্রী, যৌবন নিকুঞ্জের মধুকণ্ঠ পিক; জায়ার প্রেমকটাক্ষ বিনা সকল উৎসবই নয়নে বিসদৃশ বোধ হয়, প্রেমিক যুবার নিকট "প্রেম ঢল ঢল", প্রিয়ার লোচনের কাছে হীরকও হীনপ্রভ, কাঞ্চনচ্ছটা অপেক্ষা তাঁহার কপোলাভা বাঞ্ছনীয়, আর তাঁহার মঞ্জীর ঝঙ্কারের নিকট শতমুদ্রার নিক্কণও কটু বোধ হয়। শারদ পূর্ণিমার কৌমুদীশোভা যুবতীর হৃদয়-সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজিত, বাসন্তী উষায় ফুল্ল সরসিজ প্রেমময়ী যুবতীর মাধুর্য্যের নিকট নতশির। আর উহার সহিত রূপের সংযোগ কিরূপ মনোহর—যেন

"সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন।"

রমণীর রূপসৌন্দর্য্য ক্ষণিকের তৃপ্তি আনিয়া দেয়, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্যসম্ভূত প্রেম অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়;—যেমন কুসুম শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার সৌরভ থাকে; যেমন সুখের দিন ফুরাইলেও তাহার স্মৃতি থাকে, সেইরূপ রূপের বাঁধন ভাঙ্গিয়া যাইলেও, বিশুদ্ধ প্রেম মানবহৃদয়ে একটা আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহাতেই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই স্থলে কবি ঘটকালী বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; তাঁহার মতে রচনার পূর্ব্বে কবির কল্পনার ন্যায় প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি আবশ্যক; আত্মার তৃপ্তির জন্য, প্রণয়ের পূর্ণতার জন্য, পূর্ব্বরাগ প্রয়োজনীয়। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বরাগ ব্যাকুলতা না জানে যে জন,
সে কি পায় প্রেমে পূর্ণ রস-আস্বাদন!
যত্ন-লভ্য রত্ন বিনা না হয় যতন!
চিতে চিতে দোলাদুলি,
শূন্যে শূন্যে কোলাকুলি,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ খেলা সুন্দর তেমন;
হায় তায় বঞ্চিত অভাগ্য হিন্দুগণ!"

কিছুমাত্র শিক্ষিত হইতে না হইতেই, কিছুমাত্র জ্ঞান বিকশিত হইতে না হইতেই, শিশু বালিকা পতিগৃহে গমন করে; অত শৈশবে প্রেমের পরিচয় হয় না, স্বামীকে একটা আতঙ্ক ও ভীতির আস্পদ বলিয়া মনে করে, তাই এইস্থলে কবি বাল্যবিবাহপ্রথা অপসারিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কবির এই পূর্ব্বরাগপক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমানকালে আমরা এই পূর্ব্বরাগপ্রথার অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ এই ব্যাপারের বহুল আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, উহাতে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় পায়। তথাপি কবিকে ইহার জন্য দোষ দিতে পারি না; তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মের সম্মিলনে একটা বিসদৃশ ভাব সমুদ্ভূত হইয়াছিল। সেই কর্ম্মনাশার ভাবস্রোতে সেই যুগের প্রায় সকলেই ভাসিয়া গিয়াছিলেন, কবি সুরেন্দ্রনাথও পরিত্রাণ পান নাই; তাই প্রতীচ্য সমাজের দুই একটা প্রথা শেষজীবনেও তাঁহার নিকট কল্যাণপ্রদ বোধ হইয়াছিল, ইহাই কবির পূর্ব্বরাগপ্রথা-পক্ষপাতিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার গুণে পত্নী প্রেমময়ী ও সেবাপরায়ণা হয়, স্বামীর হৃদয় রঞ্জনে সচেষ্ট হয়। প্রেমময়ী পত্নীই জীবনমরুতে একমাত্র স্রোত-স্বতী, জীবন-আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা; জায়ার উপকারিতা অবর্ণ-নীয়, তাই কবি সেই সর্ব্বসুষমাময়ী জায়ার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণ চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায়;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে।"

এইরূপে কবি জায়াচিত্রের অঙ্কন সমাধা করিলেন। প্রথমে মাতার স্নেহ, মাতার পালন, পরে প্রেমময়ী পত্নীর সেবা মানবের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই কবির প্রতিপাদ্য।

'মহিলা'-কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব, ইহাতে নারীচরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ হইয়াছে,—প্রথমে মাতৃরূপে, পরে জায়ারূপে; সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে রমণীচরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহারও উল্লেখ আছে; দ্বিতীয় বিশেষত্ব ইহার ভাবগভীরতা। আধুনিক গীতিকবিতার যুগে ইহার শব্দবিন্যাস ও ভাষালালিত্য উৎকৃষ্ট বোধ না হইলেও, এই কাব্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও উন্নতচিন্তা এমন একটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে পাঠকের হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। মহিলাকাব্য পাঠ করিতে বসিলে প্রথমেই আমাদিগের চক্ষে পড়ে, যে, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য কবির একান্ত ইচ্ছা, ক্রমে তাঁহার করুণচিত্তের পরিচয় পাই এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রেমিক হৃদয়ের আভাস পাই; তখনই আমরা বুঝিতে পারি সুরেন্দ্রনাথ সহৃদয় ও সুহৃদয় কবি।

মহিলা-কাব্য প্রণয়নের পর হইতে সুরেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে, তথাপি তাঁহার শেষ রচনা 'হাজির' নাটকের 'পদ্মিনী' প্রভৃতি গীতগুলি বড়ই মনোজ্ঞ। এই সময়ে কয়েকজন বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'রাজস্থান ইতিবৃত্ত' অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালের মহারথ আসিয়া তাঁহাকে মোক্ষধামে লইয়া গেল।

সুরেন্দ্র যে কেবল কবি ছিলেন এমত নহে, তিনি পরোপকারী ও দরিদ্রপ্রতিপালকও ছিলেন; দীনের দুঃখমোচনে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, জ্ঞান দান করিয়া তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা দূর করিতেন, আর রোগে শোকে ভ্রাতার ন্যায় তাহাদিগের সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে চলিল, কবি সুরেন্দ্রনাথ এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। এখনও তাঁহার মহিলা-কাব্য সাহিত্য-সমাজে আদরের বস্তু হইয়া আছে এবং বোধ হয়, বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে; তাই কবি বলিয়াছেন—

"তুমি আমি কালে লীন হব সব জন
রবে শুধু কার্য্যের ঘোষণ।"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

ভাষার কথা

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ।

(সমালোচনা)

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মিঃ পি, চৌধুরীর অভি-ভাষণ তাঁহার "সবুজপত্রে"র গত ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণে অনেক সময়োপযোগী কথা আছে। সে জন্য ইহার সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমেই ভাষার কথা। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ "বীরবলী" ভাষায় রচনা করেন নাই, সবুজপত্রের ভাষায়ও নহে। তিনি নিজেই তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। "বিদূষকের আসন" হইতে "বীরবলী ঢং" চলে, কিন্তু তাহা "সভাপতির আসনের বহু নিম্নে" অবস্থিত। "সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের চিরপোষিত মত হইতে এক পদও হটিতে প্রস্তুত নহেন। তাই পরক্ষণেই তিনি বলেন, "আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।" অর্থাৎ 'এই সভাপতির আসন হইতে নামিয়াই আমি আবার আমার বীরবলী ভাষা আরম্ভ করিব, কারণ তাহাই আমার মতে গ্রন্থরচনার পক্ষে উৎকৃষ্ট ভাষা'। বীরবলী ভাষা কেন উৎকৃষ্ট হইল, তিনি তাহার দশপৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাহাতে "তথা কথিত সাধু ভাষার" জন্ম কথাও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিনি বলেন সাধুভাষা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার এই ভাষার আদি লেখক। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে "অভিনব যুবক সাহেব-জাতের শিক্ষার্থে" তিনি সাধু ভাষায় প্রবোধচন্দ্রিকা রচনা করেন।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রিকায় যেমন সাধুভাষা আছে তেমন তখনকার চল্‌তি ভাষাও আছে। "পূর্ব্ববর্ত্তী" লেখকেরা যদি তাঁহার গৌড়ীয় রীতি অবলম্বন না করিয়া তাঁহার বঙ্গীয় রীতি অনুসরণ করিতেন তবে এই ভাষা সুসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। এই দুই ভাষার মিলন-সূত্রে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছে এ কথা ভুল। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা পৃথক জাতীয়। একের পরিণতি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে, অন্যের পরিণতি তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্‌সায়। এই দুই ভাষা যোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ভাষা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত সাধুভাষা। এই সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। ৺রামমোহন রায়ও এই মৌখিক ভাষার উপরে তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি-যুগের অবসান হইল এবং ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে আমরা বঙ্গ-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য আবার ইংরাজী সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। "আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গভাষা ব্রাত্য সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরাজীও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই—কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।"

এখন কথা হইতেছে, বঙ্গসাহিত্যের যদি শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন্ ভাষা দ্বারা হইয়াছে? প্রথমতঃ যাঁহারা গৌড়ীয় রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা,—যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চল্‌তি ভাষায়ও যে তখন সুন্দর গ্রন্থ রচিত হয় নাই একথা বলা যায় না—যেমন "আলালের ঘরের দুলাল।" বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা পৃথক হইলেও

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ যাদুমন্ত্রদ্বারা এই দুই ভাষা মিলন করিয়া দিয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার হাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই দুই ভাষার মিলনসূত্রে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছে—একথা ভুল বলিব কি করিয়া?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই যদি প্রকৃত সাধু ভাষা এবং সাহিত্য রচনার উপযোগী ভাষা হয়, তবে সে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থে কাহাদিগকে বুঝিব? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব কি? নবদ্বীপ ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ত প্রায়ই কথোপকথনে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁহারা "কলম" না বলিয়া "লেখনী" বলেন, "দোয়াত" না বলিয়া "মস্যাধার" বলেন, "আদালত" না বলিয়া "বিচারালয়" বলেন, "গালগল্প" না বলিয়া "স্বকপোলকল্পিত" বলেন ইত্যাদি। আবার যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে হয়, তবে তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষার নমুনা মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশন পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্টক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে হুইসিল্ দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাই কি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার উপযোগী সাধু-ভাষা? অবশ্য মিঃ চৌধুরী বলেন, "বঙ্গভাষা ব্রাত্য সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজীও নহে"। কিন্তু যত দিন ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরেজী কথার বুক্‌নী দেওয়া না ছাড়িবেন ততদিন কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা শাপভ্রষ্ট ইংরেজী ভাষাই হইবে।

তারপর আরও এক কথা। অনেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের কথোপকথনে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক স্থানে শিক্ষিত লোকের মুখেও প্রাদেশিক ভাষা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

কলিকাতা—"আমি কোর্ত্তে পার্ব্বো না।"

যশোহর—"আমি কর্ত্তি পার্‌বো না।"

নদীয়া—"আমি কর্ত্তে পার্‌বো না।"

ঢাকা—"আমি কর্‌তে পার্‌মু না।"

ময়মনসিং—"আমি কর্ত্তাম্ পার্ত্তাম্ না।"

নোয়াখালী—"আমি হর্ত্তাম্ হার্ত্তাম্ না।"

এখন এই সকল "মাতৃভাষায়" গ্রন্থরচনা করা অপেক্ষা "আমি করিতে পারিব না" এই সাধুভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেরই বোধগম্য হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল লোক মুখে "আমি কর্ত্তাম্ পার্ত্তাম্ না" বলেন, তাঁহারাও লেখার সময় "আমি করিতে পারিব না" এইরূপই লিখিয়া থাকেন। সুতরাং এই সাধুভাষা পূর্ব্ব হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এবং এই সাধুভাষা দ্বারাই সাহিত্যের ঐক্য সংসাধিত হইতে পারে। মিঃ চৌধুরীও সেই ঐক্যের কথাই বিশেষরূপে বলিয়াছেন—

"কোনও জাতির মনের ঐক্য সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান সকলে আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধন অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়।"

কিন্তু যদি বাঙ্গালা দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে

"মাতৃভাষা" সকল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়া "সাধুভাষা"র সঙ্গে লড়াই করিতে আরম্ভ করেন, তবে সেই ভাষার বন্ধন কিরূপ দৃঢ় থাকিবে, আর আমাদের জাতীয় ঐক্যই বা কিরূপে সংঘটিত হইবে? অবশ্য ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দক্ষিণবঙ্গের (কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া অঞ্চলের) প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এবং আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত সাধুভাষাও এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষারই অনুরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয়ও বঙ্গসাহিত্যে কথিত ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন,—"ভাষার তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার অধিকতর সংশ্রব রাখিতে হইবে।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার প্রাদেশিকতা চালাইবার সম্পূর্ণ বিরোধী। গত বৎসর কলি-কাতার সাহিত্যসম্মিলনীতে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন;—

"আমাদের এতদঞ্চলের কোনও কোনও খ্যাতনামা লেখক নাকি 'করচি', 'যাচ্চি' শব্দের এরূপ আকার চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই চেষ্টার প্রতিবাদ করি। Do not যোগ হইয়া অর্থাৎ শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া don't এই আকৃতি ধারণ করে; কথা কহিবার সময় অনেক সাহেবসুবাই don't বলিয়া থাকেন; তাই বলিয়া কি কোনও গম্ভীর প্রবন্ধে কেহ don't এইরূপ পদ ব্যবহার করিবেন? তাহা কখনই করিবেন না—এখানে ভাষার পার্থক্যের কথা হইতেছে না, বরঞ্চ ধরিতে গেলে বানানের পার্থক্যের কথাই হইতেছে। কচিৎ কখনও প্রাদেশিক সংক্ষেপ বিধান গ্রাহ্য হয় বটে, তাই বলিয়া কি লিখিত ভাষার উপর জবরদস্তি করিয়া কথিত ভাষার সংক্ষেপ বিধান চালাইতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না।"

বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সাহিত্যে চল্‌তি কথা চালাইতে বলেন। তিনি বলেন, "এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে।" "আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক, চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়েকে' 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু এই চল্‌তি কথা সাহিত্যে চালাইতে হইলে যে কলিকাতা অঞ্চলের অতি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের চল্‌তি ভাষা চালাইতে হইবে একথা শাস্ত্রীমহাশয়ও বোধ হয় অনুমোদন করিবেন না। তাঁহার নিজের লিখিত ভাষাই ইহার প্রমাণ। তিনি হচ্চে, চল্‌চে, করচি, যাচ্চি, এরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করেন নাই। অথচ তাঁহার ভাষা কেমন সরল, সুঠাম, সুস্পষ্ট এবং সুমিষ্ট।

ভাষার কথা এই পর্য্যন্ত। মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে সকল কথা বলিয়াছেন এখন তাহার আলোচনা করিব। তিনি এ বিষয়ে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইবেন। তিনি বলেন,—

"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব! বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইবে। * * * বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। * * * সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সঞ্চয় করিয়াছি শুধু কথা। আমরা concreteএর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstraction * * * আমরা শিক্ষালব্ধ abstraction লইয়া সাহিত্যে

কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ—না আছে প্রাণ। * * * আমার বিশ্বাস আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ realityর প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমরা এই abstractionএর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল এই সত্য সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। * * * * আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনী দরিদ্র আছে। এই সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী।”

মিঃ চৌধুরী বাঙ্গালী লেখককে বঙ্গদেশের সহিত সাক্ষাৎ সুপরিচিত হইতে বলিতেছেন। সে পরিচয় হইবে কিসের দ্বারা? আমাদের দেশের নরনারী, ফুলফল, গাছপালা নিজের চোখে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া, প্রত্যক্ষজ্ঞানে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে বসিলে, তবে তাহা সার্থক হইবে। সেই সাহিত্যে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব প্রতিফলিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও এই একই কথা তাঁহার অভিভাষণে অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিও বঙ্গসাহিত্যে যাহাতে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব রক্ষিত হয় তাহা অত্যন্ত জেদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

“ভারতের প্রাণ ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর প্রাণ—সেই ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত সাহিত্য সাধনা। চারি পাঁচ শত বর্ষের বাঙ্গালীর ইতিহাস আমরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই চারি পাঁচ শত বৎসর বাঙ্গালী এইরূপেই কাটাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাধা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে অল্প কালের জন্য। যখন মোগল পাঠানের লড়ায়ে বাঙ্গলা বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী সাহিত্য সঙ্গীত সাধনায় বিরাম দেয় নাই। তবে যখন পশ্চিমে মারাট্টা, পূর্ব্বে ফিরিঙ্গী মহা দৌরাত্ম্য করিল, যখন পলাশী প্রাঙ্গণের প্রাণান্ত পরীক্ষায় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, এগার শত

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশে কালের করাল ছায়া পড়িল, যখন লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের আদেশে দেশে মহতী বিভীষিকা দেখা দিল, তখন কিছু কালের জন্ম সাহিত্য-সেবায় ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটী হেলান দিয়া 'মুটকলসে' ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথী লেখা, এবং বৈকালে কোনও প্রকাশ্য স্থানে গ্রামস্থ সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ভদ্র অভদ্র লোক একত্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি শ্রবণ—এ সকলে কখনই সংসার বাধা দিতে পারে নাই।"

আমরা এখানে বাঙ্গালীর প্রাণ বস্তু কি তাহা পাইতেছি, আর পাইতেছি বাঙ্গালীর গত চারি পাঁচ শত বৎসরের সাহিত্য-সাধনার একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক চিত্র। কিন্তু মিঃ চৌধুরী অক্ষয়বাবুর এই উক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"সরকার মহাশয় কোথা হইতে এই সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা আলস্যের স্বর্গ ছিল?" মিঃ চৌধুরীর খাপা হইবার কারণ এই, অক্ষয়বাবু বলেন—বাঙ্গালী তাহার সঙ্গীত সাহিত্য সাধনার বিশেষত্ব হারাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর সুকুমার সাহিত্য-সেবায় পূর্ব্বের মত প্রগাঢ়তা নাই।

"আমরা মস্তিষ্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছি জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-দর্শন, পুরাবৃত্ত-ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব-জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছি দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য, আনুগত্য-শিষ্যত্ব। জানি না কিরূপে দুই দিকের জমা খরচ কাটিতে হয়। কিন্তু আমরা কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝিবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি। * * * * হৃদয়ে কোমলতার culture বা কর্ষণ অথবা উৎকর্ষণ হয় সাহিত্য-সেবায়। বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপার বহি গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় বিষম বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে।"

ইহার উত্তরে মিঃ চৌধুরী বলেন,—"বাঙ্গালীর হৃদয়ের রক্ত যে

মাথায় চড়িয়া গিয়াছে এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙ্গালীর জীবন সংশয় হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এযুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না এ কথা নিশ্চিত।"

এযুগে কেন, কোন যুগেই সাহিত্যরচনা মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত সম্ভবপর নহে। অক্ষয়বাবু যে যুগের কথা বলিয়াছেন, সে যুগের কবিকঙ্কন কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র কি মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই? সে যুগের চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ কি গ্রন্থকারগণের আলস্যপ্রসূত? মিঃ চৌধুরী যাহাকে "আলস্যের স্বর্গ" বলেন, অক্ষয়বাবু তাহাকে "life of ease" বলেন। অবসরময় জীবন যে সাহিত্য-রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? সেই পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীর শরীরে স্বাস্থ্য ছিল, উদরে অন্ন ছিল, মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, হৃদয়ে প্রীতি ছিল তখন বিশেষ বিশেষ বাধা বিঘ্ন ভিন্ন বাঙ্গালীর জীবন মোটের উপর পরম সুখে অতিবাহিত হইত। এখনকার মত তখন কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। একথা প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাস ঘাঁটিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাকে "আলস্যের স্বর্গ" বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক সময়ের দৈন্য দারিদ্র্য রোগশোকের নরক নহে।

অক্ষয়বাবুর বক্তব্য এই, বাঙ্গালীর এক সময়ে হৃদয়ের কোমলতার যেরূপ উৎকর্ষ (culture) হইত, যে উৎকর্ষের ছাপ বাঙ্গালীর প্রাচীন কাব্যাদিতে পরিস্ফুট, এখন তাহা সম্যক্‌রূপে হইতেছে না। কাব্যসাহিত্যের প্রাণ যে হৃদয়ের কোমলতা (emotional side of mind) তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংপ্রতি অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঝোঁক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দিকে পড়িয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন (intellectual culture) হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে কাব্য ও সঙ্গীত সাধনার ব্যাঘাত হইতেছে। মিঃ চৌধুরী বলেন,—"বেশ ত! সেই বা মন্দ কি? তবে বাঙ্গলা

সাহিত্যের প্রধান দোষ এই, উহার বৈচিত্র্যের অভাব। বাঙ্গালীর হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে; বাঙ্গালীর নবশিক্ষার দোষে তাহার মন abstraction লইয়া ব্যস্ত, realityর দিকে যাইতেছে না।" অক্ষয়বাবু বলেন, "সেই reality কি? না বাঙ্গালীর প্রকৃত বিশেষত্ব—অর্থাৎ বাঙ্গালীর বহুযুগের সাধনার ফল—তাহার ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।"

তবে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে কি কাব্য সঙ্গীতাদি বাহির হইতেছে না? অজস্র বাহির হইতেছে। "বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা বই গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইতেছে।" সেগুলির সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—

"এখন মনে হয়, বেশী দিন ভাবিয়া বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানি কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধ করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে?" "চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এরকম ত চুট্‌কীতে হয় না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।"

এই সকল কাব্যে বাঙ্গালীর জীবনের প্রকৃত বিশেষত্ব ("reality") প্রতিবিম্বিত হইতেছে কি? বাঙ্গালীর হৃদয়ের "দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য, আনুগত্য-শিষ্যত্ব" প্রভৃতি ভাবের প্রকৃত ছবি ইহার কয়খানা কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে? অক্ষয়বাবু এবং মিঃ

চৌধুরী, উত্তরেই এখানে একসঙ্গে বলিবেন, “কই, তাত বড় দেখি না।” তবে হইতেছে কি? ইহার উত্তরে মিঃ চৌধুরী বলিবেন—

“দেশে ইংরাজী সাহিত্য প্রবর্ত্তিত হইলে ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। * * * Milton না পড়িলে বাঙ্গালী মেঘনাদবধ লিখিত না, Scott না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না, এবং Byron না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরাজীসাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল, ফলে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল।”

অক্ষয়বাবুও তাঁহার চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,—“আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট, মাথার মণি, চূড়ার ময়ূরপাখা বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি কুক্ষণে ইংরাজী হইতে নায়ক নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের নবীনচন্দ্র, তোমাদের নবীনচন্দ্র, তাহা সুন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। * * তিনি লিখিয়াছেন * * * “বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।”

“আমাদের দুর্দ্দশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন-নিক্ষেপ করিয়া আছি, কথনও আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি না। ঐ সমালোচক নবীনচন্দ্র ও কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিয়াই দেখুন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-কালে কেমন আমাদের আদর্শের কথা তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা—এসকল কি? তাঁহারই কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি? * * * প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের

আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়ামায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে;—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব।”

এখানে দেখিলাম, মিঃ চৌধুরী এবং অক্ষয়বাবু উভয়েই বিলাতী আদর্শে বঙ্গসাহিত্য রচনার বিরোধী; অথচ মিঃ চৌধুরী এই সকল কথা লেখার জন্য অক্ষয়বাবুর প্রতি “বীরবলিক্ এসিড্” নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি অক্ষয়বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—“বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন, এরূপ আক্রমণে মারা যাইবে না।” অর্থাৎ মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্য-শিশুর ধাত্রী, অক্ষয়-বাবু তাহার একজন আততায়ী। পাড়াগাঁয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, মায়ের অধিক সন্তানকে যে ভালবাসিতে চায় তাহাকে বলে ডাইন। আজীবন সাহিত্য-সেবাব্রত অনন্যকর্ম্মা অক্ষয়চন্দ্র সরকার হইলেন কি না বঙ্গসাহিত্য-শিশুর আততায়ী! তিনি চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে নিজের সাহিত্যসেবার কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে এখনও চোখে জল আসে।

“কত লোকের কতশত ভোগের বিষয় আছে, আইন আছে, আদালত আছে, যুদ্ধ আছে, বিগ্রহ আছে, ধন-জন-ঐশ্বর্য্য আছে, মান-গণ-সৌন্দর্য্য আছে, গাজানী বাজিরাজি আছে, পদের গৌরব আছে, যশের পতাকা আছে, আমার—‘আমার কেবল তুমি হে।’ চিরদিন একমনে একধ্যানে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছি, অন্যের মুখের দিকে তাকাই নাই, যশ মান খ্যাতির প্রত্যাশা করি নাই। সাহিত্যসেবীর সুখ্যাতি যে মুখে শিরোধার্য্য করিয়াছি, সেই হাসি-মুখেই তাঁহাদের কৃত লাঞ্ছনা অঙ্গের আভরণ করিয়াছি। অতি শিশুকাল হইতে জননী বঙ্গভাষা আমার কাছে অতি আদরের সামগ্রী,

এখন ত পূজনীয় দেবতা। মায়ের অঙ্গে আঁচড় দেখিলে আমার চক্ষে জল আসে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্গভাষার সেবা আমার সখের সামগ্রী নহে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান নহে; আমি প্রাণের টানে, হয় ত রক্তের টানে ভাষার সেবক।”

যা'ক সে কথা। কেবল অক্ষয়বাবুকে নহে, আর এক শ্রেণীর লোককেও মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্যের আততায়ী মনে করেন। অর্থাৎ যাঁহারা বেয়াদবি করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার “কাম-লোক” ও “রূপলোক” হইতে নামাইয়া আনিয়া লোকশিক্ষকের আসনে বসাইতে চাহেন। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে তাঁহার চরম কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—(১) কোন দেশেই সাহিত্য স্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই! ২) তানসেন চাষার ছেলেদের জন্য মেঠোসুরে সঙ্গীত রচনা করিতে পারেন না।

মিঃ চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণের শেষাংশে এই দুটি সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে দেশের লোকে যাহাই বলুক, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে দুর্ব্বোধ্য একথা ত কেহ কোন কালে বলে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত চিরদিনই খুব popular—তাঁহার popularity দিন দিন বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী তাঁহার তর্কের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে এক ব্রাকেটের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন,—

“সাহিত্যচর্চ্চায় যে অধিকারী ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও লোকায়ত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু আমাদের আলোচনা গবেষণা প্রবন্ধ নিবন্ধাদিই তাহাদের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। * * * * পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্ত্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যে গৌরব করিবার কিছু থাকে তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা

এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব।”

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গসাহিত্যের এমন কি ভারতীয় সাহিত্যের গৌরবের বস্তু তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তবে দেশের লোকের অনুযোগ এই, বঙ্কিমের লেখা যেমন আবালবৃদ্ধ বনিতা জলের মত সরলভাবে বুঝিয়া তাহার রসাস্বাদ করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেরূপ বুঝিতে পারে না। ইহার কৈফিয়তে মিঃ চৌধুরী বলেন,—

“এযুগে সাহিত্য যে লৌকিক নহে, তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে গড়া সাহিত্য। * * * শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর, * * * শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই এই শ্রেণীর সাহিত্য।”

ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরাও অনেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝিতে পারেন না, ইহার মানে কি? মিঃ চৌধুরী একথার জবাব দিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া আছেন। তিনি বলেন,—

“কবি যাহা দান করেন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক।” “প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন, তাহার কারণ তাঁহারা পৃথিবীর শিক্ষকদিগের শিক্ষক।”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহারা ত অনেকেই পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকদিগের লেখা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সেক্সপীয়ার বুঝিতে পারেন, মিল্‌টন বুঝিতে পারেন, সেলি, বাইরন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বুঝিতে পারেন, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী বুঝিতে পারেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাঁহাদের হয় না এ কথা কিরূপে বলা যায়? এই সকল কবি কি লোকশিক্ষক নহেন? কেবল কি শিক্ষকদিগের শিক্ষক অর্থাৎ মাষ্টারদিগের প্রফেসর? আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে, কাব্যরচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—"কান্তাসম্মিত তয়োপদেশ যুজে"—অর্থাৎ কান্তার ন্যায় মধুর ভাবে উপদেশ দান করা। আমাদের মহাকবিগণ চিরদিনই লোকশিক্ষাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করিতেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে ত্রিলোকের গুরু বলা হয়। "একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ, তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ" ইত্যাদি শ্লোক-প্রসিদ্ধি আছে। অর্থাৎ—পদ্মযোনি ব্রহ্মা, নদীপুলিনে জাত ব্যাস এবং মহর্ষি বাল্মীকি ইঁহারা ত্রিলোকের গুরু আদিকবি। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই স্কুলমাষ্টারি করিতে অপমান বোধ করেন নাই। তানসেনের সঙ্গীতে যেমন ওস্তাদগণ মুগ্ধ হইতেন, তেমন আবার নিরক্ষর মূর্খ লোকেও মুগ্ধ হইত। এরূপ জনশ্রুতি আছে, একটি চাষাজাতীয় স্ত্রীলোক তাহার শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া লাউ কুটিতে কুটিতে তানসেনের সঙ্গীতে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিল, যে লাউভ্রমে তাহার শিশুসন্তানের একটা পা কাটিয়া ফেলিয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ আকাশে ভূতলে, সাগরে শৈলে, যে সকল সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতমূর্খ ভদ্রচাষা সকলেরই সমান অধিকার। বিকসিত কুসুম, স্নিগ্ধশ্যামল পল্লব, সুনীল আকাশ, উদীয়মান দিবাকর, পূর্ণিমার চন্দ্র, অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বুধি—এ সকলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। এমন কি বর্ব্বর কোল সাঁওতাল নরনারীগণও উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে নৃত্য করিতে ভালবাসে। ঈশ্বরের রাজ্যে এই সকল সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে সকলেই সমান অধিকারী, কারণ ঈশ্বর মানবমাত্রেরই হৃদয়ে সৌন্দর্য্যবোধস্পৃহা প্রদান করিয়াছেন। তবে সকলেই সকল

প্রকার সৌন্দর্য্য সমান ভাবে ভোগ করিতে পারে একথা বলা যায় না। জগতের বিখ্যাত কবিগণ কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই তাঁহাদের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য মনে করেন নাই। সেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অন্ত-রালে সমাজের উপকার হইবে এরূপ উদ্দেশ্যকেও তাঁহারা মনে স্থান দিয়াছেন। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা নহে, কিন্তু নীতিশিক্ষার যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎ-কর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্ত-শুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বিবিধ প্রবন্ধ—ভবভূতি)।

কবিবর রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিতা শুধু শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। তিনিও সময় সময় সাধারণ লোকের শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়া-ছেন। তাঁহার "সোনার বাংলার" গানটা সেই দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সাধারণ লোকের উদ্দেশ্যেই "মেঠো সুরে" রচিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের লোক সেটাকে গ্রহণ না করিয়া স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের রচিত সেই "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের" গানই ধরিয়া বসিল এবং পল্লীতে পল্লীতে তাহা গাইয়া বেড়াইত।

পরিশেষে ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলিতেছি: মিঃ চৌধুরী যাহাই বলুন না কেন; রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত লোকশিক্ষার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না, ইহা দেশের বিষম দুর্ভাগ্য। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার মনের গঠন এদেশের লোকের সহিত খাপ্ খায় না। একজন কলেজের প্রফেসর সেদিন বলিতেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ যত সহজে বুঝিতে পারি,

বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি তত সহজে বুঝি না কেন?" ইহার উত্তরে আর একজন প্রফেসর বলিলেন,—"রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে চিন্তা করেন বলিয়া।" একথাটির মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য না থাকিলেও আংশিক সত্য যে নিহিত আছে তাহার কোন ভুল নাই। রবীন্দ্রনাথের "পুলক" যদি গাছে গাছে না নাচিয়া নরনারীর গাত্রে কদম্বকুসুমের ন্যায় বিকসিত হইত, তাঁহার "সঙ্গীত" যদি আকাশে না ঘুমাইয়া নরনারীর কণ্ঠে সুরতান লয় যোগে মুখরিত হইত, তাঁহার "খুসী" যদি আকাশে না ফুটিয়া নরনারীর অধরে দীপ্তি পাইত, তাঁহার "ক্রন্দন" যদি কাহারও পিছে পিছে না ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অশ্রুধারারূপে বিগলিত হইত, তবে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত। একজন গৃহস্থ তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথিদিগের ভোজনের জন্য নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন। ভোজনের সময়ে দেখা গেল, ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে সবরকম মসলা যথোচিতরূপে দেওয়া হইয়াছে, অথচ সেগুলি সব বিস্বাদ হইয়াছে। তাহার কারণ, ভুলক্রমে একটা জিনিস তাহার কোনটার মধ্যেই পড়ে নাই—সেই জিনিসটার নাম লবণ। কবি রবীন্দ্রনাথও রাশি রাশি কাব্য রচনা করিয়া শুধু একটি বস্তুর অভাবে ইচ্ছাসত্বেও সেগুলিকে স্বদেশবাসীর উপভোগ্য করিতে পারিতেছেন না। সেই বস্তুটির নাম—প্রাণ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

অনুরাগিনী

কি তোর পিরীতি রাই!
তুহার পিরীতি স্মরণ করিতে
আপনা হারায়ে যাই!
নাহিক কামনা— নাহিক বাসনা—
আপনা বলিতে নাই;
তুঁহু যে বঁধুর চরণ-নূপুর,
চলনে বাজিছ তাই।
ফুটিয়াছ ধনি! সূরজ-বদনী *!
বঁধুর বদনে চাই',
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বদন তুহার
বঁধূরে হেরিছ রাই!
বঁধুর কারণ জীবন ধারণ,
বঁধুর বিরহে তাই
নয়ন মুদিয়া রহ গো ডুবিয়া
মরম ভিতরে যাই'।
শোণিতে শোণিতে বঁধুর মুরতি,
হৃদয়ে বঁধুর বাস;
পিরীতি-বিবশ তনুর পরশ—
বঁধুর হরষ-পাশ!
রূপ-নিরঝর ঝরে ঝর ঝর—
বঁধুয়া সিনান করে;
উথলে মরমে পিরীতি-অমিয়া
বঁধুর ভোগের তরে!

---

* সূরজ-বদনী—সূর্য্যমুখী।

আদর সোহাগ— মানের বিরাগ
বঁধুর পূজায় ডালি ;
বঁধুর মূরতি করিছ আরতি
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি'।
সরম ভরম— কুলের ধরম
স্বকরে করিয়া চূর
হোমের অনলে দিতেছ ছিটায়ে,—
গন্ধ ছুটিছে দূর !
স্ফীত পয়োধর করে থর থর—
তনুতে বসন নাই ;
বিভোর ধেয়ান হরল জ্ঞেয়ান,
টুটল কালহুঁ ঠাঁই !
পূজা সমাপিয়া আপনারে দিয়া
বঁধুরে তুষিলি রাই !
তুহার পিরীতি না মিলে জগতে,—
গোলকে আছে কি নাই !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

কথা-সাহিত্য

পশু ও পরীগল্প।

মানবজাতির সর্ব্ববিধ সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে কাব্যই যে প্রাচীনতম এই মতটা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। তবু ইহার মধ্যে যে কিছুমাত্র ভাবিবার অবসর রহিয়া যায় নাই তাহা বলা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র এবং কোনপ্রকার লিপিযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে কবিতা তাহার তরল ছন্দোগতিতে সময়-স্রোতের উপর দিয়া মানবেতিহাসের আদিযুগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের দিকে বহিয়া আসিতে পারিয়াছে। কিন্তু গদ্য জিনিসটা ভারি; কাব্যের লঘু এবং হাল্কা নৃত্যতালটা তার অভ্যাস নাই; কাব্যের মত পরিমিত নূপুরশিঞ্জিত পদক্ষেপে মানবমনের মধ্যে অনন্তকালের জন্য প্রতিধ্বনির অনুরণন জাগাইয়া রাখা তার কর্ম্ম নয়; মানব-চিত্তের স্মৃতিধৃত ছন্দের ছাপ-টুকু বংশানুক্রমে পুত্রপৌত্রদের অর্পণ করিয়া যাইবার যে ক্ষমতা সেটা তার নাই। স্মৃতি এবং মানব মনের মত সূক্ষ্ম কালি-কাগজে এই অতিকায় জীবটিকে বাঁধিয়া রাখা যায় না, বহির্জ্জগতের লিপি ও মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-নিগড় দিয়াও যে খুব বেশী দিনের জন্য পারা যায় তা'ও কি করিয়া বলিব। 'শ্রুতি' কিম্বা 'স্মৃতি' আখ্যা পদ্যই নিতে পারে, গদ্য নয়। সময়-স্রোতের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় লঘু চরণ ফেলিয়া বহিয়া আসিবার গতি যার ছিল না, সময়-স্রোতের অতলে তলাইয়া যাইবার গতি ছাড়া তার আর কি থাকিতে পারে?

সেই জন্যই মনে হয় প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি যেমন মন্ত্র আও-ড়াইয়াছে, গান গাহিয়াছে, তেমনি হয় ত অবসর-রঞ্জনের জন্য কথায়, আখ্যায়িকায়, কল্পকাহিনীতে আপনাদের কল্পনার আবাদ করিয়াছে। কিন্তু সেগুলি ধরিয়া রাখিবে কে? হয় ত সেগুলি অতি তুচ্ছই

বিবেচিত হইয়াছে। কথাসাহিত্যিক চেষ্টার সেই আদিমতম মৌখিক যুগের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া বৃথা।

ইংরাজী সাহিত্যে যে ধরণের গল্পগুলিকে Fables, Parables আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই বোধ হয় কথাসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। এই পশু-রূপক-গল্পের প্রথম ভারতবর্ষীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ "পঞ্চতন্ত্র" নামে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলিতে নীতিনিষ্ঠ ভারতবর্ষ ধর্ম্ম সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিত্য-ব্যবহার্য্য সত্যগুলিকে পশুর রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছে। মানবীয় সাহিত্য-চেষ্টাকে মোটামুটি সময়ক্রম অনুসারে যে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (Symbolic, Classic ও Romantic), তার মধ্যে আদিমতম যুগটি হইয়াছে রূপকের যুগ। বক্তব্য বিষয়টিকে খোলাখুলি না বলিয়া তার অনুরূপ ছদ্ম-ব্যাপারের সাহায্যে পাঠকের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলা, পাঠকের নিকট বক্তব্য বিষয়ের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া, এবং চেষ্টা-লভ্য সত্য-গ্রহণের যে আনন্দ সেটা দেওয়াই হইয়াছে এই যুগের সাহিত্য-লক্ষণ। অন্যায়কারী অথচ প্রতাপান্বিত রাজা, সমাজ, সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গের চেষ্টা অনেক সময় এই রূপকের অন্তরাল খুঁজিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইলেও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি যে ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তার ঐতিহাসিক এবং আভ্যন্তরিণ প্রমাণের অভাব নাই। বাস্তবিক বহুদিন প্রচলিত বৌদ্ধজাতকগুলির এটা যে একটা কাঁটাছাঁটা ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ সে সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাইবেলের রূপক-গল্প এবং খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বের লোক ইশফের বিখ্যাত কথা-গ্রন্থের উপর এই ভারতবর্ষীয় গল্পগুলির প্রভাব-লক্ষণ বিদ্যমান। সংগৃহীত হইবার পর আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়া গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালীয়ান, জার্ম্মাণ এবং ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ইউরো-

ষীয় মধ্যাব্দীয় যুগের সাহিত্যে এগুলি যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজ এবং সাহিত্যেতিহাসের নির্দ্ধারকেরা অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রাচীন এবং আধুনিক লেখকের মধ্যে যাঁরা এই ছাঁচের গল্প লেখার কিছুমাত্র মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন, এমনকি তাঁরাও এই ভারতবর্ষীয় পঞ্চতন্ত্র এবং পরবর্ত্তী সংগ্রহ-গ্রন্থ "হিতোপদেশে"র নিকট পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে ঋণী।

ঈশপের পর গ্রীসদেশে ফ্রিড্রাস্ ও এভিয়েনাস্ পদ্যে পশু-গল্প লিখিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে ফরাশী সাহিত্যে কবি লা ফন্‌টেন্ এবং ফেনিলন, ইংরাজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর গে এবং ডড্‌স্‌লি এবং জার্ম্মাণ সাহিত্যে লেসিং এই ধরণের গল্প লেখার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফেনিলনের গল্পগুলিতে লা ফন্‌টেনের ব্যঙ্গ্য এবং শ্লেষের ক্ষুরধার নাই, পরন্তু সেগুলি কল্পনা ও চিন্তার সৌন্দর্য্যে এবং একটি অনাবিল মানব-প্রেমের স্বচ্ছতায় মণ্ডিত। ইংরাজী সাহিত্যের গের গল্পগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দৈত্য ও পরীর গল্পগুলিই মানব-সাহিত্যের কথাসাহিত্যিক চেষ্টার দ্বিতীয় ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। মানবের আধুনিক এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরীসাহিত্যের সৃষ্টির ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীক পৌরাণিক কল্পনার কতটুকু হাত আছে, মোটেই আছে কি না তাহা পুরাতত্ত্ব-বিদের বিচার্য্য। তবু সাধারণ পাঠক এবং সাহিত্য-চিন্তকের দিক হইতে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

হিন্দু ধর্ম্মসাধনা সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বোদ্বেল একই প্রাণরসে ওতপ্রোত দেখিলেও, হিন্দু পৌরাণিক কল্পনার দেবদেবীরা যেন এই বিশ্বপ্রকৃতি এবং জগদ্ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াই মানবের ভক্তি-অর্ঘ্য আদায় করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর প্রকৃতি-পূজা, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা কিম্বা অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রমূর্ত্ত দেবদেবী-পূজার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে সত্য;

কিন্তু আপেক্ষিক তারতম্যের দিক হইতে আমাদিগকে এই কথা বলিতে হয়—গ্রীসই যেন বিশেষভাবে সমস্ত প্রকৃতিকে, প্রকৃতির বিভিন্ন রাজ্য, আকাশ পাতাল জল ও অগ্নিকে, কত বিভিন্ন আকার এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যের দেবদেবীর লীলাস্থলরূপে পরিগণিত করিয়া আপনার পৌরাণিক অতিমানবীয় সৃষ্টিকল্পনা সার্থক করিয়াছে এবং আপন 'পেগান' ধর্ম্মের প্রকৃতি-লক্ষণ প্রতিভাত করিয়া দিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের পরী ও দৈত্যদের সহিত হিন্দু দেবদেবী অপেক্ষা যে এই গ্রীক দেবদেবীর বেশী সাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যায় তাহা বুঝি না।

তবুও এ কথা ঠিক যে দৈত্য ও পরীনিসেবিত আধুনিক কথা-সাহিত্যিক শাখার আদিম ধারাটা প্রাচ্য; বর্ত্তমান ইউরোপ এই পরী-সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য যে প্রত্যক্ষভাবে প্রাচ্যের কাছেই ঋণী তাহা সে অস্বীকার করে না। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ decimal figures, চতুরঙ্গখেলা এবং পশু-রূপক ও দৈত্য-পরীর গল্পগুলা যে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে ধীরে ধীরে আমদানী হইয়াছে, ইউরোপীয়েরা তাহা মানিতে বাধ্য হন। অন্যত্র পরী-সাহিত্য সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্বেই যে ভারতবর্ষ বেতাল, সিংহাসন এবং শুকের মুখে এই অতিপ্রাকৃত মনোরম সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে এখন আর কোনও সন্দেহ থাকিবার কথা নয়।

ভারতবর্ষ এই অতিমানবীয় সাহিত্যের আদি-নিদর্শন দিলেও আরব ও পারস্যই এই পরী-সাহিত্যের প্রধান জন্ম ও পুষ্টিভূমি। স্পেন-প্রবাসী মুরেরা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোদ্ধারা প্রাচ্যদেশের সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে এই পরী-রাজ্যের ইন্দ্রজাল পাশ্চাত্য কল্পনায় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

ইউরোপীয় পরী-সাহিত্যে দুই রকম অতিমানবীয় জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার মধ্যে যেগুলি মানবের মানসকল্পনা-জাত শ্রেষ্ঠ সুষমার খনি, "জলে স্থলে" যারা "মায়াজাল গাঁথে", ফুলের মধু

খাইয়া এবং ফুলের ঘরে ঘুমাইয়া যারা ফুলের মত পেলব, রামধনুর বর্ণচ্ছটায় বাস করিয়া যারা বিচিত্র এবং শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মনোহর, যারা "হাওয়ার মতন, নেশার মতন, কুসুমগন্ধ-রাশির মতন" মানব-চিত্তে মাধুর্য্যের মাদকতা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ভাসিয়া বহিয়া যায়, যারা দুইটি মানব-হৃদয়কে মিলাইয়া দিবার জন্য নানারূপ কৌশল-জাল বিস্তার করে এবং সময় সময় কোনও সৌভাগ্য-শালীকে তাদের অপার্থিব এবং লোভনীয় প্রেমানুগ্রহ দান করে, যারা

"হেলে বটমূলে, বসে নদীকূলে
প্রমোদ-শিখরে বসি নিশি করে ভোর,"

যারা "কুমুদের কোলে" "জ্যোছনা-বিছানা পাতি" শয়ন করে, নিসর্গ-মাধুর্য্যের অশরীরী মূর্ত্তি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেই কামচারীরা যে বিলাস-লীলায়িত প্রাচ্য কল্পনার নিজস্ব সামগ্রী তাহাতে কোনও ভুল নাই। আর এক প্রকার অতি-জীব যারা আছে, তারাও এদের মত অলৌকিক ক্ষমতা রাখে; কিন্তু তারা বিশেষ করিয়া শারীরিক শক্তিশালী, কুৎসিৎ, রক্তামোদী এবং মানবের অহিতসাধনে রত; প্রেম করার উপযুক্ততা তাদের চেহারায় এবং ব্যবহারে আদৌ নাই। 'স্যাগা' ও 'এড্ডা'র দেশ, ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্রোর্ম্মিপরিসেবিত হিমানী-শীতল স্কেণ্ডিনেভিয়া তাদের জন্মভূমি। প্রথমোক্তরা যেমন প্রকৃতির মাধুর্য্যের মূর্ত্তি, 'গথিক' কল্পনার এই অতি-জীবরা তেমনি প্রকৃতির বন্য উদ্দামতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ।

মধ্যযুগের ফরাসী Troveursদিগকে এই পরীরা কৃপা করিয়াছিলেন। আর কৃপা করিয়াছিলেন Signor Basileকে, যিনি নেপ্‌ল্‌সের কথ্যভাষায় পরীসাহিত্যকে Pentamerone উপহার দিয়াছেন। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ পরীসাহিত্য ফরাসীদেশই দিয়াছে। পশু-গল্পে যেমন, পরী-গল্পেও তেমনি, ফরাসীরাই আধুনিক জগতের মান রাখিয়াছে। Perraultএর পরী-গল্প এবং Madame Lussanএর যাদু-গল্পগুলি তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। উচ্ছৃঙ্খল পরী-

সাহিত্যে Perraultএর গল্পগুলির সংযত কল্পনায় এবং ভাষার সহজ প্রবাহে একটা বিশেষত্বের ছাপ আছে। এই গল্পগুলিই ইংলণ্ডে "Stories of Mother Goose" নামে বিখ্যাত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরবদের সামরিক গৌরব যখন লুপ্ত হইয়া আসিল, যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহারা যখন গৃহে ফিরিয়া বিলাসে গা ঢালিয়া দিল এবং মরুস্থলীর প্রান্তদেশে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে কল্পনার রাজ্যে অসম্ভবের আবাদ আরম্ভ করিয়া দিল তখনকার সেই সুরা-সরাব গালিচা-কিংখাব এবং জরী-জহরতের যে আরবদেশ তার অতৃপ্ত বিলাস-লীলা অসম্ভবকে সম্ভবের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার আশ্চর্য্য প্রয়াসে, উদ্দাম ও অদম্য কামচারী ও বহু-রূপী সৃষ্টি-কল্পনায়, বিচিত্রোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-মোহের ইন্দ্রজালে যে অমর আখ্যায়িকাগুলিতে সার্থক হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে সেগুলির পরিচয় এবং বিশ্ব-মনের উপর তাদের প্রভাবের কথাটা আর কাহা-কেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দুঃসাহসিক কল্পনার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে পারস্য উপন্যাস আরব্য উপ-ন্যাসের চেয়ে হীন হইলেও সূক্ষ্ম কল্পনার সলীল বর্ণনাভঙ্গিতে উহার গৌরব বরং আরব্য উপন্যাসের চেয়ে বেশী।

মোস্‌লেম কল্পনার এই পরীরা মানব-সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবীতেই বাস করিতেন। মানব-সৃষ্টির পর তাঁরা দেব ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীব-রূপে জিনের দেশে প্রয়াণ করিয়াছেন; পাশ্চাত্য কল্পনায় এখন তাঁরা পাতালপুরে বাস করিতেছেন। সেখান হইতে মাঝে মাঝে শুধু আসিয়া এই মর্ত্তভূমিতে তাঁরা পায়ের ধূলা দিয়া যান। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলিয়া যান সেখানে তাঁদের পাদক্ষেপের নীচে দিকে দিকে বসন্ত মুঞ্জরিয়া উঠে, দোয়েল-কোয়েলের কণ্ঠ-বীণার তার কাঁপে, রসাবেশের হিল্লোল ছুটে, মনে মনে মনোভবের পূজা সুরু হয়, আর পরী-মানবের গোপন সুমধুর রস-সম্পর্কের কত কাহিনী গজাইয়া উঠে, বিধাতা-প্রদত্ত আঁখি-যোড়া বিধাতার আলোকের

দিকে খুলিয়া রাখিয়া সেগুলিকে বিশ্বাস করা বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। বাস্তবিক এঁরাই বাহিরের এবং মানব-মনের বসন্তকে এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইতে দেন নাই; এঁরাই জরামৃত্যুকে পিছু পিছু তাড়া করিয়া অক্ষয় শ্যামলতায় মানব-চিত্ত ও প্রকৃতিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই তাঁরা যে আমাদের নমস্য সে সম্বন্ধে ত কোন ভুলই নাই; তেত্রিশ কোটির মধ্যে তাঁদের নাম-ধামের পরিচয়টা কেন পাওয়া যায় না সেটাই আশ্চর্য্য।

অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে ডেনমার্কের এণ্ডারসন পল্লী-গল্প লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি বহুরকমের লেখক এদিকে হাত চালাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর এই সব গল্প কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠে না—দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং পুরাণেতিহাসকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-কল্পনার অভিব্যক্তিরূপেই এগুলি ফুটিয়া উঠে। কাগজ মলাট এবং ছাপার কালো অক্ষরের লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামের ছাপা লইয়া সমাজ-স্রোতের উপর বুদ্বুদের মত এগুলি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে সত্য—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এগুলির মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্বের ছাপ নাই। সমাজের সম্মি-লিত মূঢ় এবং আত্মগূঢ় কল্পনাশক্তি এদের পিছনে রহিয়াছে—সমাজের সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বকালের ব্যক্তির মন হইতে তিল তিল রস আহরণ করিয়া সমাজ-মন এই তিলোত্তমাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে এবং লোকে-লোকে কালে-কালে পরিপার্শ্বের অনুরঞ্জন মাখিয়া অতি সূক্ষ্ম-ভাবে এবং মন্থর গতিতে সমাজ এবং কালোপযোগী বিশিষ্টতা এদের দান করিয়া চলিয়াছে। এইজন্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নানা দেশের পল্লী-সাহিত্যে নানা সৌসাদৃশ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বিচারে অনেক জায়গায় স্থানীয় বিশেষ চেহারাটি বাহির হইয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এটা সমাজ-বিশেষত্ব, ব্যক্তি-বিশেষত্ব নহে।

সমাজের সম্মিলিত কল্পনা-শক্তি ইহার রস যোগাইয়াছে বলিয়াই এই পরী-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতা এমন সার্ব্বজনীন। তবে অবশ্য ব্যক্তি-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতার সঙ্গে এই সমাজ-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতার একটা মস্ত পার্থক্য আছে।

বহুদিন হইতে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে এই পরী-রঞ্জিত অকেজো কল্পনাকে কাজের পৃথিবী হইতে ঝেঁটাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আজও তার সেই কাজ শেষ হয় নাই। ফলে, পরীরা কর্ম্মমুখর দিবালোক এবং মানবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে সরিয়া পড়িয়া নির্জ্জন বনচ্ছায়ের ছায়ালোক এবং কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্যোৎস্না-কিরীট লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে পাগল বসন্ত হাওয়া যে এই পরী-রোগের বীজকে কোন্ অলোক হইতে উড়াইয়া আনিয়া কোন্ দুর্ব্বলতার ফাঁক দিয়া মানব-মনে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, কবিকুলের কাব্য-সাহিত্যের গায় গায় তার লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের জাগ্রত্ত মানব-মনের যে তন্দ্রা-বিজড়িত কল্পনা-নিবিড় কোন্‌টির উপর এই অশরীরী হাওয়া-রাণীদের কোমল চরণ পড়ে তাহার ইতিহাস প্রকাশ্য দিবা-লোকে কীর্ত্তন করার মতন, অথবা একটু উল্টাইয়া বলিতে গেলে, নিশীথ-সমুদ্রের মত সুপ্ত মানব-চৈতন্যের কিনারায় চরণালোকিত চঞ্চল বীচিগুলার উপর পরীরাণীদের লঘু পাদক্ষেপের খবর পাওয়া এবং দেওয়ার মতন দুঃসাহস একমাত্র কবিদেরই আছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগে ছাতিম-তলা এবং চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিদায় লইয়া সৃষ্টির অথবা অনাসৃষ্টির যত আজগুবি জীবেরা কবির কাব্যে তাদের অমর বাসস্থান খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এবং এইখানে বিভিন্ন কবির মনরূপ আতস কাচের ভিতর দিয়া সাহিত্যের এই অতিলৌকিক রস বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষত্ব লাভ করি-তেছে। সমাজে যাহা শুভ্র এবং সনাতন, অথবা বর্ণগন্ধহীন এবং অচেতন ভাবে পড়িয়াছিল, আধুনিক কবির কাব্যে আসিয়া তাহা

বিচিত্র টুক্‌রা রঙে শতধা ফাটিয়া পড়িয়া নবীন জীবন-ধারায় হিল্লো-লিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ এই সম্বন্ধে কল্পনা করা ছাড়িয়া দিয়াছে, ব্যক্তি আসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অতি-জীবরা এখন আর হাটে বাটে দেখা দেন না; পল্লীর প্রাচীন গাছগুলির কঙ্কাল বাহির করিয়া দিয়া বিলীয়মান যৌবনশ্রীর মত তাঁহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছেন। সমাজের চক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই এখন ব্যক্তির বক্ষে আসিয়া বাসা লইয়াছেন; বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞতার দিবা-লোক হইতে তাঁদের নির্ব্বাসন দিয়াছে, তখন মৌন-মূঢ় মনের আব-ছায়ায় লুকোচুরি খেলাই তাঁদের কাজ হইয়া উঠিল। বাহিরে যাঁদের আমল দেওয়া হইল না, তাঁরাই কোন সুযোগে সিঁদকাঠি চালাইয়া মনের অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং দিনে ডাকাতির পরি-বর্ত্তে আড়ালে আবডালে মন-চুরির মোহে আধুনিক মানবকে অভি-ভূত করিয়া দিব্য আরামে মুচ্‌কে হাসিয়া আপনাদের নির্ব্বাসনের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন।

বাহিরের জিনিসকে মনের ভিতর দিয়া এই প্রকাশের রহস্যের মধ্যেই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ অতিলৌকিক সাহিত্য-চেষ্টার একটা মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

'থিয়োসোফিষ্ট' প্রমুখ আধুনিক যুগের সুইডেনবর্গের কবি-বৈজ্ঞা-নিক চেলারা আবার এই অতিজীবদিগকে বাহিরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হইলে সাহিত্যের অতিলৌকিকতা আবার পুরোণো ধারায় ফিরিয়া যাইবে, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে, পুরোণো ধারার নূতনতর এবং উন্নততর মুর্ত্তিতে নব-জীবন লাভ করিবে। তা' যতদিন না হইয়াছে ততদিন এই মানস-লুকোচুরিই চলুক।

এই পশু এবং পরীদের কথা আজ এখানে শেষ করিব। তাঁরা মানব বিশেষতঃ মানবকদিগকে যে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করিয়া

থাকেন তার জন্য তাঁদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। রুসো যাহাই বলুন না কেন, এই গল্প-সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা চিরকাল বিজ্ঞদের গালি খাইয়া আসিলেও, ইহার শিক্ষা এবং আনন্দ দিবার ক্ষমতা কালের পরীক্ষায় টিকিয়া আসিয়াছে। যে প্রাণীরা মানবের মুখ হইতে ভাষা এবং মানব-চিত্ত হইতে সমস্ত বৃত্তি কাড়িয়া লইয়া এবং যে অতি-জীবরা মানবকে মাধুর্য্যের শিক্ষা দিয়া, প্রত্যক্ষাতীতের প্রতি ঝাপ্‌সা অথচ প্রবল আকর্ষণ জন্মাইয়া দিয়া, মানবের কল্পনাকে জলে-স্থলে-আকাশে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন, সেই পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সেই জিন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, তাল-বেতাল, আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ যতসব ব্রহ্মদৈত্য ও ডাইনি-পেঁচো-পূতনা প্রভৃতি মানব-নিম্ন এবং অতিমানবদের নমস্কার করিয়া আজ বিদায় হইলাম, ভবিষ্যতে মধ্যপথের মানবকে লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

[৬]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা।

উপনিষদ সকল যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মূল আশ্রয়, সেইরূপ ভগবদ্‌-গীতাকেই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার আদি গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। উপনিষদ পড়িয়া ব্রহ্ম কে, ইহা জানিবার ইচ্ছা জাগে। সেইরূপ ভগবদ্গীতা পড়িতে যাইয়াই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ কে, এই প্রশ্ন উঠে। কৃষ্ণের নাম ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের এক কৃষ্ণ ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষির পিতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, এই কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতায় অনেকগুলি শূক্তের ঋষি এক কৃষ্ণ। সম্ভবতঃ ইনিই বিশ্বকায়ের পিতা। সে যাহাই হউক, ঋগ্বেদে কৃষ্ণকে ঋষিরূপেই দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীকালেও কৃষ্ণের এই ঋষিত্বের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কারণ মহাভারতে যে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাই, যিনি নারায়ণরূপে পূজনীয় হইয়াছেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ পূর্ব্বে একজন মহর্ষি ছিলেন, তিনি অর্জ্জুনের সঙ্গে নর-নারায়ণ নামে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া পরে ভারত-যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, মহাভারতেই এই কাহিনী পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিম্বদন্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে আর এক কৃষ্ণের নাম পাই। ইনি অনার্য্য রাজা ছিলেন। তার পর অথর্ব্ব সংহিতায় এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে; ইনি কৃষ্ণকেশী নামে একজন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। গীতা এবং ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণকে দু'একবার কেশীনিসূদন বলা হইয়াছে। ইহাও বোধ হয় অথর্ব্ব সংহিতার কথারই জের মাত্র। কিন্তু এসকল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে একজন ঋষি বা রাজা কিম্বা বীরপুরুষ

বলিয়াই জানিতে পারি; তাঁহার ঈশ্বরত্বের কোনও উল্লেখ এসকলে নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেই প্রথমে এই ঈশ্বরত্বের অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

"অথৈতদ্ঘোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়, উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভুব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত—অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অর্থাৎ—অনন্তর আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামক ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন। তিনি অন্তকালে এই তিনটি আশ্রয় পাইলেন—'তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

পরবর্ত্তী শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুতাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্রুতিতে সম্ভবতঃ তাহার মূল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রবল কৃষ্ণজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জিজ্ঞাসা প্রথমে সুস্পষ্টরূপে উঠিয়াছে ভগবদ্-গীতায়।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই গীতা হিন্দুদিগের নিকটে মোক্ষপ্রতিপাদকশাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। আর এই জন্যই বেদান্ত-সূত্র যেমন উপনিষদের সত্য মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে বলিয়া প্রস্থানত্রয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ ভগবদ্‌গীতাও সকল উপনিষদের সার-নিষ্কাষিত করিয়াছে বলিয়া, এই প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্ভূত হইয়াছে। গীতামাহাত্ম্যে আছে—

সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অর্থাৎ সকল উপনিষদ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, পার্থ বৎসস্বরূপ, আর গীতোপদেশের অমৃতবস্তু দুগ্ধস্বরূপ, সুধীজনে এই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে

ভগবদ্‌গীতাকে উপনিষদেরই সার বলিয়া লোকে গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য পণ্ডিতেরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়সম্মত বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় করিয়াই গীতাভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে এমন সকল কথা আছে, যাহা উপনিষদে নিতান্ত বীজাকারে খুঁজিয়া পাইলেও, সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এই জন্য প্রকৃত-পক্ষে উত্তরমীমাংসার বা বেদান্তসূত্রের দ্বারা এ সকল কথার সম্যক মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। এই সকল কথা হইতেই গীতার কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

উপনিষদের মূল কথা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই সকল উপনিষদ জগ-তের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ। এই ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। এই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে—তিনি আছেন, এই মাত্রই বলা যায়, এই ব্রহ্মের এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনও প্রকারের উপলব্ধি সম্ভবে না।

অস্তীতি ব্রুবীতি কথং তদুপলভ্যতে।

এই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম কেবল ধ্যানগম্য।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

অর্থাৎ, পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে ধারণা করা যায় না, অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, অথবা তপস্যার কিম্বা যাগযজ্ঞের কিম্বা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা, বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, সাধক ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এই নিরবয়ব ও নির্গুণ ভাব ছাড়া ব্রহ্মের সগুণ ভাবের কথাও উপনিষদে বিস্তর আছে। এক-দিকে ব্রহ্ম যেমন জগদাতীত, সেইরূপ অন্যদিকে তিনিই জগৎরূপে পরিণত, জগতের অতীত হইয়াও তিনি জগতকে ব্যাপিয়া আছেন।

স্বরূপতঃ তাঁর কোনও অবয়ব বা রূপ নাই, অথচ তিনি সকল রূপে-তেই আছেন।

তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে

পৃথিব্যাদি সকল লোক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কিছু নাই ও থাকিতে পারে না। এই আশ্রয় আশ্রিত ভাবের জন্য নিরবয়ব ব্রহ্মবস্তু সকল অবয়বেতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ অবয়ব ধারণ করিয়া আছেন।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাহ্য বস্তুর রূপ-ভেদে সেই সেই বস্তুর রূপ-ধারণ করিয়াছেন, তেমনি যিনি এক ও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনিও নানা বস্তুভেদে তত্তদ্‌বস্তুর রূপ হইয়াছেন, আর তৎসমুদায়ের বাহিরেও আছেন।

এইরূপে উপনিষদ একদিকে যেমন ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বা জগদা-তীত, তুরীয় স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ আবার তাঁহার সগুণত্ব বা জগদ্ব্যাপিত্ব, বা জগদ্রূপত্বও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই নির্গুণ ও সগুণের অতীত যে আর কোনও তৃতীয় স্বরূপ বা রূপ তাঁর আছে, কি থাকিতে পারে, ইহার কোনও সুস্পষ্ট সন্ধান উপনিষদে আছে বলিয়া জানি না। যে বেদান্তসূত্র সকলপ্রামাণ্য উপনিষদের মীমাংসা ও সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাতেও এই তৃতীয় স্বরূপের কোনও বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই না। তবে কোনও কোনও সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, সগুণত্ব বা জগ-দ্রূপত্ব, এই দুই ছাড়া আরও এক রূপের কথা বলিয়াছেন বটে—তাহা তাঁর জীব-রূপ। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একদিকে জগদ্রূপে,

অন্যদিকে জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন ; সগুণ ব্রহ্মের জগদ্রূপত্ব ও জীবরূপত্ব এই দ্বিবিধ প্রকাশ বা পরিণতি আছে। এই দু'এর অতীত যে তত্ত্ব তাহাই নির্গুণতত্ত্ব বা তুরীয় তত্ত্ব। এতটুকু পর্য্যন্ত উপনিষদে বা বেদান্তসূত্রে বেশ সুস্পষ্টই পাওয়া যায়। কিন্তু গীতা পুরুষোত্তম বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকারেরা কেহ কেহ

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ (১ম অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র)

এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া "অত্তা" শব্দের শ্রীপুরুষোত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই পুরুষোত্তম উপনিষদের ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

কঠোপনিষদের এই শ্রুতির উপরেই এই সূত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শ্রুতির অর্থ এই,—

"ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন মাত্র— (অর্থাৎ ঘৃতাদি যাহা অন্নে মাখিয়া খাওয়া যায়) সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে ?"

এই ভাষ্যকারেরা বলেন যে এই শ্রুতিতে যাঁহাকে অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলা হইয়াছে, তিনি পুরুষোত্তম, কিন্তু অত্তা শব্দে এই-খানে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কেননা, মৃত্যুকেও তাঁহার উপ-সেচন বলায় চরাচরবিশ্ব সমস্তই তিনি আত্মসাৎ করেন, ইহা বলা হইল। আর ব্রহ্মই "তজ্জ" ও "তল্ল"—অর্থাৎ তাঁহা হইতেই চরা-চরবিশ্বের জন্ম হয় (তজ্জ), আর তাঁহাতেই এই চরাচরবিশ্বের লয় হয় (তল্ল)। এইজন্য এই অত্তা বা ভক্ষক অপর কেহ নহেন, ব্রহ্মই স্বয়ং। এখানে ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলার সার্থকতা কি, ইহা বুঝা যায় না।

ফলতঃ উপনিষদ ও বেদান্তসূত্র পড়িয়া গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলেই এখানে ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার একটা নূতন স্তরে যাইয়া যেন উপস্থিত হই। গাছের সঙ্গে অঙ্কুরের যেমন প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নাই, গীতার এই সকল নূতন তত্ত্বের সঙ্গে সেইরূপ সম্ভবতঃ প্রকৃতপক্ষে উপনিষদেরও কোনও বিরোধ না থাকিতে পারে। অথচ গাছ একটা নিতান্ত নূতন বস্তু, অঙ্কুরেরই পরিণত অবস্থা হইলেও, অঙ্কুর হইতে ভিন্ন। সেইরূপ গীতার এইস্তরে যে সকল তত্ত্বের সন্ধান পাই, তাহা উপনিষদের তত্ত্বেরই বিকাশ হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন। উপনিষদ ব্যক্তকে ধরিয়া অব্যক্তে গিয়াছে, ক্ষরকে ধরিয়া অক্ষরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—শ্রুতি, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র, এ সকলই এই ব্যক্ত ও এই ক্ষরকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভূতগ্রাম ব্যক্ত, প্রত্যক্ষ। এই ভূতগ্রাম একদিন ছিল না, তখন ইহাদের কথা কিছুই জানিতাম না। তখন তারা অব্যক্ত ছিল। ক্রমে একদিন তাহারা জন্মিল, ব্যক্ত হইল, তখনই আমরা বা অপর কোনও জ্ঞাতা তাহাদিগকে জানিলেন। এই ভূতগ্রাম এইরূপে জন্মিয়া বা ব্যক্ত হইয়া, কিছুদিন এই ব্যক্তভাবেই রহিয়া গেল। তারপর, ক্রমে আবার তাহারা অব্যক্তে অদৃশ্য বা মৃত হইয়া গেল। গীতায় পড়িলাম—

> "অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
> অব্যক্ত নিধনান্যেব"—ইত্যাদি।

হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত থাকে, মাঝখানে ব্যক্ত হয়, আবার নিধনে বা লয়কালে অব্যক্ত হইয়া যায়। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্বের উপরেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল ও আদি প্রতিষ্ঠা। আর যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া কেবলই প্রবাহের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। পরিণতির পর পরিণতি, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, অপচয় ও উপচয়ের স্রোতে পড়িয়া ভূতগ্রাম

নিয়ত কম্পিত হইতেছে। এই প্রবাহই ক্ষর। শুদ্ধ সত্তার দিক্ দিয়া যাহাকে ব্যক্ত বলিতে পারা যায়, বিকাশের অভিব্যক্তির বা পরিণামের দিক্ দিয়া তাহাকেই ক্ষর বলিতে হয়। আর ব্যক্তের অন্তরালে যেমন অব্যক্ত, সেইরূপ যাহা ক্ষরিতেছে তারই অন্তরালে এই ক্ষরণের নিত্য সাক্ষী হইয়া, অক্ষর বিরাজ করেন। যাহা অব্যক্ত তাহাই অক্ষর। বস্তু এক, কেবল দুই দিক্ দিয়া এই একই বস্তুকে দেখিয়া, তাহার এই দুই নাম হইয়াছে। এই ব্যক্ত ও অব্যক্তকে, এই ক্ষর ও অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া আমাদের যে সকল অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। উপনিষদ এই দুইটি মুখ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ উপনিষদে বা বেদান্তসূত্রে, বিশেষভাবে পরিষ্কাররূপে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই তত্ত্বের বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু গীতাতে পড়িলাম—

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৫-১৬।
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫-১৭।
> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৫-১৮

অর্থাৎ—এ লোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ :—এক ক্ষর-পুরুষ, অপর অক্ষর-পুরুষ। যাবতীয় ভূতসকল ক্ষর নামে অভিহিত হয়। আর কূটস্থ যিনি তাঁহাকেই অক্ষর বলা হয়। এই দু'এর অতিরিক্ত আর এক পুরুষ আছেন, তিনি উত্তম বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পরমাত্মা কহে। ইনি অব্যয় এবং নির্ব্বিকার ঈশ্বর হইয়াও, ত্রিলোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সকল লোককে প্রতিপালন করেন।

আমি এই উত্তম পুরুষ। আমি ক্ষয়ের অতীত, অক্ষরের অপেক্ষাও উত্তম, এই জন্যই লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি।

এই পুরুষোত্তম কে? এখানে এই প্রশ্ন উঠে। গীতা যাবতীয় ভূতগ্রামকে ক্ষর বলিতেছেন—"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি"; সুতরাং আমরাও এই ভূতগ্রামের অন্তর্ভূত, ক্ষর পুরুষের অন্তর্গত। উপনিষদ ব্রহ্মবস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" —যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, বলিয়াছেন, এই যাবতীয় ভূতগ্রামকেই এখানে সর্ব্বাণি ভূতানি বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই ক্ষরপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। আর কূটস্থ যে চিদ্‌বস্তু, যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপাদন করিয়া যাহার মধ্যে এই পরম চৈতন্য, এই সদ্বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বজীবাত্মান্তর্যামী পুরুষই অক্ষর-পুরুষ। এই অক্ষর-পুরুষ সাক্ষীচৈতন্য। জগতের নিত্য পরিবর্ত্তন-প্রবাহের সাক্ষী হইয়া তিনি রহিয়াছেন। তিনি কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মের সাক্ষী মাত্র। তিনি ভোক্তা নহেন, ভোগের সাক্ষী মাত্র। তিনি স্বয়ং অপরিণত থাকিয়া সকল পরিণামের সাক্ষ্যদান করেন। এই ক্ষর আর ঐ অক্ষর, ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইয়া আছেন। এই পর্য্যন্ত বোঝা যায়। উপনিষদে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। কিন্তু তার পরেই শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ছাড়া আর একজন পুরুষ আছেন। তিনি উত্তম পুরুষ। কেহ কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়াও থাকে। তিনি এই ত্রিলোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অক্ষর বটেন, কিন্তু কূটস্থ অক্ষর পুরুষ যেমন নিষ্ক্রিয়, এই উত্তম পুরুষ সেরূপ নিষ্ক্রিয় নহেন। তিনি কেবল সাক্ষী নহেন, তিনি নিয়ন্তা, ঈশ্বরও বটেন। তিনি কর্ম্মের নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত সাক্ষীমাত্র নহেন, কিন্তু নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকিয়াই আবার সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, প্রেরয়িতা, কর্ম্মাধিপ তিনি। আর

এই জন্যই তিনি ক্ষর পুরুষের অতীত, আবার অন্যদিকে কেবল সাক্ষীমাত্র যে অক্ষর পুরুষ, তাঁহা হইতেও তিনি উত্তম। এই জন্যই লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে। তার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত!

অর্থাৎ—হে ভারত! যে মোহাতীত হইয়া এইরূপে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জানে, ত্রিলোকে তার আমার সম্বন্ধে আর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। আর আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিয়া এই সর্ব্ববিদ্ সাধক সকল ভাবের দ্বারা আমার ভজনা করে।

উপনিষদের শেষ কথা ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ব্রহ্মকে জানিলেই জীব মুক্তি লাভ করে, উপনিষদের এই প্রতিজ্ঞা। এই ব্রহ্মই বিশ্বের পরম তত্ত্ব। উপনিষদ এই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়াছেন। উপনিষদের ভাবে গীতার অর্থ করিলে, এখানে এই অক্ষর পুরুষ, এই কূটস্থ পুরুষকে ব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। গীতাতেও (অষ্টম অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোক) ভগবান্ পরমব্রহ্মকেই অক্ষর বলিয়াছেন,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্ম মুচ্যতে।

সুতরাং গীতার নিজের অভিধানেও পঞ্চদশ অধ্যায়ের

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ"

এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরমব্রহ্মকেই বোঝা সঙ্গত। উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে উপনিষদের সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র না হইয়া, গীতাতে এমন কিছু কিছু তত্ত্বের উপদেশ আছে, যাহা উপনিষদে নাই, এটি স্বীকার করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত না হইলে, গীতা যে ব্রহ্মতত্ত্বের অতীত ও তদপেক্ষা উত্তম ভগবদ্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা অতি স্পষ্টরূপেই ধরিতে পারা যায়। আর

সে অবস্থায় এখানে অক্ষর বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায় না, এটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য অযথা পরিশ্রমও করিতে হয় না। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া গীতাপাঠ করিলে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়োবীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

যে অক্ষর পুরুষের কথা বেদবিদেরা বলেন, যতিগণ বীতরাগ হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, যাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সংক্ষেপে আমি সেই ব্রহ্মপদ বলিতেছি।

গীতার এই শ্লোকে কঠোপনিষদের একটি শ্রুতির প্রতিধ্বনি সুস্পষ্টভাবেই জাগিয়াছে। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১ম-১৫।

অর্থাৎ সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থীগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ ॥ ১ম-১৬।

অর্থাৎ—এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহার হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বন পরম
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১ম-১৭।

গীতা এই অক্ষর ব্রহ্মকেই যে এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। "তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে"—সেই ব্রহ্মকে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, বলিয়া তিনি ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন,—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৮-১৩।

উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁ-কারকেই ব্রহ্মলাভের অনন্য প্রতি-যোগী, শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়। জ্ঞান হইতেই মুক্তি। আর

স্বদেহং অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।

আপনার দেহকে অরণি আর প্রণব অর্থাৎ ওঁকারকে উত্তরারণি করিয়া, ধ্যানসহকারে নির্ম্মন্থন করিলে নিগূঢ় ভাবে আত্মাতে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। প্রণবের আবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্ম লাভের জন্য অন্য কোনও উপা-য়ান্তর অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও স্মরণ করিতে বলিতেছেন। যে ওঁ এই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দের আবৃত্তি করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কেবল ওমিত্যে-কাক্ষরং ব্রহ্মের আবৃত্তি দ্বারা পরম গতিলাভ হয় না, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বা স্মরণ আবশ্যক। অথচ উপনিষদ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ওঁকার প্রতিপাদক ব্রহ্মই জীবের শ্রেষ্ঠ আলম্বন, এই ব্রহ্মবস্তুকে জানিয়া জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মলোক অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮-১৬।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত লোক আছে তৎসকল লোকবাসীগণই সংসারবর্ত্মে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কেবল আমাকে পাইলেই জীবের আর পুনরায় জন্মলাভ হয় না।

ব্রহ্মকে যেমন অক্ষর বলা হয়, সেইরূপ অব্যক্তও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে যেমন অক্ষর-পুরুষ অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন, সেইরূপ এই অব্যক্ত অপেক্ষাও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতেই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, আর প্রলয়কালে এই অব্যক্তসংজ্ঞক তত্ত্বেতেই বিলীন হইয়া যায়। বারম্বার এইরূপ ভূতগ্রাম সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আবার প্রলয়কালে তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। এখানেও "যতো বা ইমানি" শ্রুতি এবং "জন্মাদ্যস্যযতঃ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্রহ্ম বা অব্যক্ত হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়, শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে আপনাকে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ৮-১০।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮-১১।

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত লইয়াই জগৎ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্বই সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর এক সনাতন ভাব আছে। সমুদায় ভূতগ্রাম নষ্ট হইলেও এই বস্তু নষ্ট হয় না। যাহাকে অব্যক্ত-অক্ষর বলা হয়, তাহাই পরম গতি বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠধাম।

গীতার এই সকল শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের পরেও যে আর একটা তত্ত্ব আছে, সর্ব্বপ্রথমে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভাবেই গীতায় একটা নূতন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেয়। এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই কৃষ্ণজিজ্ঞাসার মূল।

গীতাতে আরও অনেক নূতন কথা উঠিয়াছে। কৃষ্ণজিজ্ঞাসার ও কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সে সকল কথা তুলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অণিমা

অন্তহীন, অন্তহীন আকাশের নীলিমা-সাগরে,
বৃন্তহীন নীলশতদলোপরি, অনিন্দ্যসুন্দরি,
নৃত্য করি লীলাভরে, নীলাম্বরী সাড়িখানি পরি,
হেলায় এলায়ে কৃষ্ণকেশরাশি দিগন্ত উপরে,
মহিমা গরিমা পুনঃ সঙ্কোচিয়া অণুর ভিতরে
অণিমা প্রকাশ কর অকস্মাৎ! মুক্তারূপ ধরি
শুক্তিমাঝে যাও প্রবেশিয়া! ত্রিলোক-ঈশ্বরি!
কোটীনামে, কোটীরূপে দেখা দাও বিশ্ব-চরাচরে।
হে বিরাট মহাকালি, অনন্তের খুলিয়া কপাট,
কোটী রবি, কোটী শশী করে ল'য়ে, কন্দুক-লীলায়
মহাহাস্যে থাক রত! লোফালুফি বালিকার প্রায়।
সদ্য-স্ফুট গোলাপে আবার প্রবেশ করি ঝাট,
হও তুমি নিশির শিশির! গুপ্ত করি আপন গরিমা,
আমারি মাঝারে আছ!—জীবরূপে অপূর্ব্ব অণিমা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

থেকো সাথে

[কোন ইংরাজী কবিতা হইতে অনুবাদিত ।]

(১)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
যখন নামিবে সন্ধ্যা চঞ্চল চরণে
আঁধার ঘনাবে আপনার মনে
(তখন) থেকো নাথ, থেকো সাথে ;
যখন সকল উপায় যাবে ঘুচি'
শেষ সুখ-আশা যাবে মুছি'
হে অশরণ-শরণ
(তুমি) আসিও তখন ।

(২)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
যবে মম জীবনের ক'টি দিন
আরো' হইয়া আসিবে ক্ষীণ ;
ধরণীর সুখ, ধরণীর আলো
কিছুই যখন লাগিবে না ভালো
সে ধ্বংস মরণ মাঝে,
হে চিরন্তন, আসি দাঁড়া'য়ো কাছে।

(৩)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
ওগো, মোরে ক্ষণিকের দেখা নাহি দিও
ক্ষণিকের কথা নাহি ক'রো
(তাতে আরো যে বেদনা)

হে অন্তরতম তুমি অন্তরে মম রহিও,
—ক্ষণিকের দেখা নাহি দিও
(না চাহি ক্ষণিকেরি চেতনা)

(৪)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
নাহি আসিও রাজাধিরাজ রূপে,
তোমার ও রূপে পরাণ যে কাঁপে,
শান্ত সুন্দর রূপে যেন আসিও ;
(আমার) হৃদয়ে বাহিরে যত অমঙ্গল
তুমি মঙ্গল রূপে নাশিও
শোক তাপ দুঃখ দৈন্য যত
আমার চোখের জলে সব হরিও
পাতকীতারণ রূপে আমারে ধন্য করিও।
হে চিরসাথি মম, সাথে সাথে তুমি থাকিও।

(৫)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
তোমাতে যে মোর অনুক্ষণ কাজ ;
তোমা বিনা প্রলোভনে
কেমনে দিব হে লাজ ?
যেন শত বিপদের মাঝে,
তোমারি মঙ্গল কর মোরে রাখে,
তোমারি শুভ-ইচ্ছা
আমার হীনতা ঢাকে।
আমার হৃদয়ে, তোমার মুরতি
ওগো, যেন চির জাগে।

(৬)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
ডরি না কাহারে—থেকো সাথে তুমি
শত অপমান ?
বেদন না মানি।
অশ্রু জল ?
তাহাতে কি হানি ?
হে মরণ! আজি যে হারিলে ভাই!
বিশ্বপতি সাথে মোর,
তব পরাজয় তাই।

(৭)

যখন নয়ন মম আসিবে মুদিয়া
চির বিরামের তরে,
তখন আঁধার উজলিয়া
হয়ো হে প্রকাশ ;
দেখা'য়ো তব আলোক-লোক
ধরণীর দুঃখ শোক
সকলি যাইবে দূরে।
নবীন দেশে নবীন প্রভাতে
আবার জাগিব আমি
জীবনে মরণে কাছে থেকো
ওগো স্বামি!

শ্রীঅন্নদাভূষণ সেন

আঁধার ঘরে

[কথা-নাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[পল্লীগ্রামের পথের এক প্রান্তে উলুখড়ে ছাওয়া দোকান-ঘর ও চটী-ঘরের ঝাঁপ বন্ধ...ঘরের ভিতর মেঝেতে পিঁড়ী পাতিয়া বসিয়া কাদম্বিনী চরকা ঘুরাইয়া সূতা কাটিতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। ভরা ভাদ্র মাস, রাত্রির অন্ধকারে ভীষণ ঝড়ে বাহিরের গাছের ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিতেছে, মেঘ ঘোর অন্ধকারে অবিরাম বারি-বর্ষণ করিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোক ও বজ্রপতনের শব্দ, দূরে দূরে পেচক ও শৃগাল উচ্চ তীব্র বিকৃত স্বরে ডাকিতেছে। ঘরের সম্মুখে ও পার্শ্বে চূর্ণী নদীর জলে ডাক উঠিয়াছে—নদী ফেনময়। কাদম্বিনীর বয়স বাইশ বৎসর, দেখিতে খুব সুন্দরী, পরিধানে আধ-ময়লা লাল পাড় সাড়ী, হাতে শাঁখা ও খাড়ু, চরকা ঘুরাইতে ঘুরা-ইতে সূতা টানিয়া গান গাহিতেছে,—]

লবডং সবডং গাম্‌নী গুম্‌নি
চরকা আমার ডাকে রে
লবডং সবডং ..

চরকা আমার ভাতার পুত,
চরকা আমার হিয়া,
চরকার দৌলতে আমার সাত বেটার বিয়া রে
লবডং সবডং...

চরকা আমার সোনার দোত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী রে
লবডং সবডং...

ছয়মেসে তূলা আমার
নয়মেসে পাঁজ,
সেই সূতো কাটে যেন আস্ত কলার মাজ রে
লবডং সবডং ..

মাগী কাটে সরু সূতো
মিনসে ধরে ছাতি
(আমার) চরকায় যদি রোদ লাগে ত মুয়ে মারব নাতি রে
লবডং সবডং...

হ্যাঁ, আর তোর চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে না, দূর তোর...প্রাণটা যেন খাবি খেয়ে উঠ্‌ছে, আর পারিনে, আজ ছ ছটা বছর, মিনসে কোন্ চুলোয় গেল, তার খই খবর হ'ল না, দূর—আর মিনসেই বা কোথায় যে মুখে দুটো নাতি কসাব...

(আবার চরকায় নূতন সূতা ও পাঁজ জড়াইতে জড়াইতে)

পোড়া পেট...পোড়া পেটে চুলোর ছাই দুটো ছেঁচ্‌কিপোড়া না গুজ্‌লে ত নয়, এ বাকড় ত ঠাণ্ডা হবে না—দিন রাত্তিরই ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে, কবে যে নিভ্‌বে...

(বাহিরে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিল ও কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়িল, দরজার ফাঁক দিয়া ও চালের ফাঁক দিয়া আলো চম্‌কাইয়া উঠিল)

মাগো, কি ছ্যাওর ঝিল্‌কাই দিচ্ছে, কক্কড়্ কড়্ ডাক্ ডাক্, খুব ডাক্, আকাশ মাটি ফাটিয়ে ডাক্...কাদি পোড়ারমুখীর আটচালায় পড়ে মরণা—তাত পারে না, কেবল আকাশের গায় চক্‌মকি ঠুক্‌ছে, আর ডেকে মর্‌ছে,...আমি একলা ঘরে থাকি রে মুখপোড়া, একলা ঘরে থাকি, আমার এ ভাঙা ঘরে তোর ও আলোর ঝিল্‌কী কেন বল্ ত; আমার ভয়ও নেই, ভরসাও নেই; সুখও নেই, স্বস্তিও নেই। আমার ও ভাঙা ঘরে তোর ও আলোর চম্‌কানি কেন বল্...যাদের আশা ভরসা থাকে তাদের সব চলে লো সব চলে; আমার কি, আমার

কি, মিনসে ছিল, কোন চুলোয় যে গেল তার ঠিক নেই, আজ ছটা বছর ঘুরে গেল, বেঁচে আছে কি মরেছে তারও খই খবর নেই, একটা গাঙ্‌শালিক ছিল, তাও মরে গেল, দু'একবার মা বলে ডাক্‌ত, তাও আর শুন্‌তে হবে না...তা এ সব কেন বল্‌,—

(দূরে শৃগালেরা ঘোর রবে ডাকিয়া উঠিল···)

বলি এ রাত্তিরে কাদিরই ঘুম নেই, পোড়া শেয়ালগুলোর কি মরণ, ঘুম নেই গা। এই দুর্যোগ, মর্‌ছে মড়ারা মড়া খেয়ে,...হুয়া, হুয়া হুয়া, যেন দেয়ালা কর্‌ছে, মর...

(বাহিরে গাছের ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ঝড়ে ভাঙিতে লাগিল... বাতাস আটচালার কাণায় কাণায় গোঁ গোঁ, চড়্ চড়্ শব্দে ঘুরিতে লাগিল)

ভাঙ্, ভাঙ্, নেনা নে, কাদির আটচালাখানা উড়িয়ে নে যা না...মর্, আকাশ যেন কেঁদে কেঁদেই মল,...আর কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌, কাঁদ্‌লে কেউ শোনে না লো, কেউ শোনে না, পোড়ারমুখি, কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌, কাঁদলে কেউ শোনে না লো, কেউ শোনে না, পোড়ারমুখি, কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌...অনেক কেঁদেছি কই কেউ শোনে না—ওই মাঠের পানে চেয়ে আলের ধারে বসে অনেক কেঁদেছি, গুম্‌রে কেঁদেছি, ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, চেঁচিয়ে কেঁদেছি, মাটিতে মুখ গুঁজ্‌ড়ে নিশ্বাস চেপে চেপে কেঁদেছি, কেউ শোনে না...ওই নদীর ধারে বসে চূর্ণীর জলে কত চোখের জল পড়েছে, আকাশের তারারা শুনেছে...না লো আর কাঁদিস্ নি। (উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল...) উঃ নদী যেন ক্ষেপে উঠেছে...(জোর হাওয়ায় প্রদীপটা নিভিয়া গেল—দরজা বন্ধ করিতে করিতে)...যাক্, বেশ হয়েছে, সত্যিই ত, আমার আবার পিদীম জ্বালা কেন, অন্ধকারে আছিস্ অন্ধকারেই থাক্—আঃ জ্বালাতন, আজ তিন দিন চটীতে লোক নেই, কাল যে কি খাব তার ঠিক নেই। চক্‌মকিটা আবার গেল কোথা...

দূর ছাই, ইচ্ছে করে মাথায় পাথর মেরে মরি, আঃ মিন্‌সেকে একবার পাই ত থোড়্‌কুচি করি—আর পারিনে।

(প্রদীপ জ্বলিল—চরকাটা সরাইয়া রাখিয়া, মাথার চুল গুটাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে)…মরণ্‌, চুলগুলোও বাদ সাধে—এ থাকাই বা কেন, কার জন্যে থাকা ? (এমন সময়ে নেপথ্যে বাহিরের দরজার কাছে, একজন 'কাদি', 'কাদি', 'কাদম্বিনী' বলিয়া কে ডাকিল)…কে নাম ধরে ডাকে, ওঃ মরন্‌ আর কি, সেই শেখর পোড়ারমুখো বুঝি…না পোড়ারমুখোর জ্বালায় আমায় এবার দেশ ছাড়্‌তে হ'ল…আর যাই বা কোন্‌ চুলোয়, পোড়া বয়স যে সঙ্গে যাবে গা…

(নেপথ্যে…"কাদি—কাদু—কাদম্বিনী—তোর পায়ে পড়ি ভিজে মলুম, একবার খোল্‌")

না খুলব না, তুমি কেমনতর মানুষ গা ? না মিন্‌সে বড় বজ্জাত বাপু। কিন্তু তাই ত…আচ্ছা আমি একলা বুকে হাত দিয়ে শুয়ে থাকি, তায় তোর মাথার টনক্‌ নড়ে কেন ?

শে। কাদু ! তোর পায়ে পড়ি কাদু…

কা। না বাপু, আমায় তিষ্ঠুতে দিলে না, মাগো কোথা যাব মা, মুখপোড়া যেন চাঁদখানা, উঁকি মারে, প্রাণটা যেন ছাঁত করে ওঠে…নাগো না আমি এখন খুল্‌তে পারব না, আমি খুল্‌ব না—যাও…

শে। তোর পায়ে পড়ি, কাদি লো, তোর পায়ে পড়ি, আমি ভিজে মরে গেলুম্‌ লো। কাদু লক্ষ্মী, বড় ঝড়্‌, কাদি চূর্ণী সাঁত্‌রে পার হয়ে তোর কাছে এসেছি, কাদি আমার হাত পা এলিয়ে পড়েছে…

কা। আমার এখানেও বড় ঝড়, আটচালা টেঁকা ভার, যাও, যাও, কেন অমন কর্‌ছ, যাও আমি একলা ঘরে, একলা, খালি বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে থাকি, তোমার কি এই উচিত ? (দরজার ফাঁক দিয়া দেখিয়া) আহা ! সত্যি ভিজে গেছে,

কাঁপ্‌ছে, আহা! এ্যাঁ, চূর্ণী সাঁতারে পার হ'ল...তবে কি করি, অ্যাঁ কি সোন্দর, আমার ভাঙা ঘরে...আমার এ ভাঙা ঘরে...ওঃ ওঃ).. দাঁড়াও বাপু হ্যাঁ...

(কাদম্বিনী সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শেখর গৃহপ্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল...সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, মাথা হইতে জল ঝরিতেছে...পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন)

শে। কাদু! কাদু!

কা। (কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা শুখ্‌নো কাপড় লইয়া পরিতে দিল) শেখর! তোমার কি এই উচিৎ...আমি গরিব, সূতো কেটে পেটের জ্বালা নিবুই, চটীতে লোক আসে, চাল ডাল বেচে খাই! তোমার কি এই উচিত...শেখর! শেখর! এতদিন পরে—একি শেখর!

শে। কাদু! আমি যে আর পারিনে, সত্যি বল্‌ছি, কাদি! তোর জন্যে যেন প্রাণটা কর্ কর্ করে ওঠে, থাক্‌তে পারিনে। খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, দু'দণ্ড কাজে মন দিতে পারিনে...কাদি! আমায় বাঁচা, কাদি! আমি আর পারিনে কাদু! আমি নিশ্চয় মরব, কাদি! কাদি! উঃ কাদি! কাদি! আর কতদিন কাদি! কেঁদে কেঁদে জীবন যাবে বল, কাদি! তোর পায়ে ধরি......

কা। কি কর, কি কর, অ্যাঁ! দেখ, দেখ, আমার শেষ কি হবে তা বুঝ্‌তে পারছ না, আমার শেষ কি হবে বুঝ্‌তে পারছ না...

শে। কাদি! যতদিন বাঁচ্‌ব মাথার মণি, বুকের হার, উঃ কাদি! আমি মরব কাদি আমি মরব, কাদু! কাদম্বিনি! কাদু! কাদু! আর যে পারিনে কাদু!

(শেখর কাদম্বিনীকে বাহু প্রসারণে বাঁধিতে গেল—কাদম্বিনী দূরে সরিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল)...

কা। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার পায়ে ধরি, আমার ছেড়ে দাও। (শেখর অঞ্চল ধরিল) ওগো! কি কর! কি কর! উঃ তুমি যে বড্ড সোন্দর, বড্ড সোন্দর, ওগো! তুমি যাও, যাও, যাও, আমার মাথা কেমন কর্‌ছে, আমি কি কর্‌ব, আমি কি কর্‌ব, শেখর! তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও ...ছেড়ে দাও...

শে। কানু! আমি যে তোকে বড় ভালবাসি...

কা। ভালবাস! কেন, গরিব বলে, অ্যাঁ—না—না—আমায় ভালবেস না, আমায় ভালবাস্‌তে নেই, ছিঃ আমায় ভালবাস্‌তে নেই, দেখ্‌ছ না (হাতের নোয়া দেখাইয়া) অ্যাঁ...না—না—না—তুমি বড্ড সোন্দর, শেখর! না—না—যাও, যাও, তোমার পায়ে পড়্‌ছি, কি কর্‌ছ শেখর, কি কর্‌ছ, উঃ শেখর! কেন ভালবাস, উঃ আমার মাথা কেমন কর্‌ছে! এ সুখ না জ্বালা শেখর! না—না—আমায় যে ভালবাস্‌তে নেই শেখর!

শে। কানু! কানু! প্রাণের কানু! না—না—ভালবাসি, ভালবাসি...জীবন নিয়ে আর এ খেলা খেল্‌তে পারিনে কানু! কানু!

(শেখর কাদম্বিনীকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল—কাদম্বিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া পড়িয়া গেল.. খোঁপা খুলিয়া নিবিড় কাল কেশের রাশি শেখরকে ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল)।

কা। শেখর! ছাড়, ছাড়, শেখর! কি কর! কি কর! তোমার পায়ে ধরি, উঃ তোমার নিশ্বাসে যেন আগুন জ্বল্‌ছে শেখর! ছাড় শেখর, আমার সর্ব্বনাশ কর না—উঃ, উঃ, শেখর কেন তুমি এত সোন্দর শেখর! শেখর! উঃ—

শে। কানু! কানু! প্রাণের কানু!

কা। শেখর! শেখর! ওই বিদ্যুতের ভেতর থেকে কে বারণ কর্‌ছে, ওই দেখ শেখর! শেখর! (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) প্রদীপটা নাচ্‌ছে কেন?......

(কাদম্বিনী অঞ্চলে প্রদীপ নিভাইয়া দিল...গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল...বাহিরে তখন বিদ্যুৎ ও বজ্রের কড়্ কড়্ শব্দের সঙ্গে চারিদিক হইতে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল ও ঘরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল)...

কা। শেখর! শেখর! মাটিতে পা পড়্ছে, না—পা—গা—মাটি যেন কাঁপছে, অন্ধকার, অন্ধ...

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[চূর্ণীনদীর তীরে ..কাদম্বিনী গ্রামের পথ দিয়া নদীর দিকে কলসী কক্ষে লইয়া চলিযাছে ..তখন সন্ধ্যা নামিযাছে .নদীর অপর প্রান্তে সূর্য্য ডুবিতেছে, জলের হিল্লোলে রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে...দূরে জলের রেখা ও আকাশ ধোঁযার মত মিলাইতেছে, নদীর তীরে চকাচকিরা ডাকিতেছে, একটা বেনেবউ পাখী 'খোকা হোক্', 'খোকা হোক্' বলিয়া ডাকিতেছে।]

কা। লজ্জা করে গো, লজ্জা করে, কেমন যেন লজ্জা করে, এমন ত ছিল না, শেখর! শেখর! আমার আঁধার ঘবে পিদীম জ্বাল্লি কেন শেখর, একি হ'ল শেখর! আমি যে লজ্জায় মরে গেলুম, লজ্জায় যে আর বাঁচিনে, মরে গেলুম, শেখর লজ্জার সুখে মরে গেলুম, লজ্জায় আর বাঁচিনে, শেখর আর যে সুখ ধরে না লো! না শেখর! বুকের ভেতর যেন ফুলের মত কি ফুটে উঠ্ছে ..ওরে পোড়ারমুখো, এ আকাশের চাঁদ হাতে ধরে এনে দিলি কেন,

আমি ত জানতাম না লো সই
আমার দেখনহাসি ওই,
আমার আঁধার ঘরে মাণিক
তোমায় আড়ালে দেখি ক্ষণিক,
আমার বুকের মাঝের মাজ

তোমায় রাখি বুকের মাঝ,
তোমার ঠোঁটের একটু হাসি
আমি কেবলই ভালবাসি,
আমার পিরীত-ফুলের মধু
আমার কত রসের বঁধু,
আমার রসিক নাগর রায়
রসে আপনি গলে যায়,
তোমায় হিয়ার পাতে রাখি
আমি নয়ন মুদে দেখি।

ইচ্ছে করে চোখ বুজে চোখের ভেতর রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুকের কাছে জেগে থাকি। শেখর! শেখর! প্রাণ যেন কেমন কেমন করে, পোড়া লোকের মুখের পানে আর চাইতে পারিনি কেন? যেই কেউ তাকায়, অমনি যেন চোখের পাতা নুইয়ে পড়ে, যেন লজ্জাবতী লতা ছুঁলেই নুইয়ে নেতিয়ে পড়ে, এ যেন কিসের কি হ'ল, শেখর! শেখর! কি হ'ল, বড় লজ্জা করে, আর যে পারিনে...

(পূর্ব্বদিকে ঘন পত্রের আড়াল হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতেছে) ওরে পোড়ারমুখো চাঁদ! সেদিন তুই কোথায় ছিলি, সে রাত্তিরে কেন তোকে দেখিনি, আজ আসুক তোকে দেখে নেব, সে আমার কত সোন্দর দেখ্‌ব, একবার মিলিয়ে নেব, তুই আলো কি সে আমার আলো! আর মিলিয়েই বা কি নেব, তোর চেয়ে সে আমার সোন্দর! শেখর! শেখর! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠেছে, ওই চাঁদের রোশনি পড়্‌ছে, আর আমার সব যেন ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ছে। চকাচকিরা কেমন ডাক্‌ছে...চকা-চকি-চকা-চকি শুধুই তোদের ডাকা-ডাকি। ডাক্, ডাক্, ডাক্‌লে প্রাণের লোক মেলে লো মেলে, ডাক্...ডাক্‌লেই মেলে...

(কাদম্বিনী কলসী লইয়া জলে অবতরণ করিল—কলসীর গলায় কাপড় বাঁধিয়া কলসী ভাসাইয়া দিয়া জলে ঢেউ দিতে লাগিল।)

কল্ কল্ কল্ কল্, তোর কেন এত ছল্ বল্, তুই চলেছিস চল্—তুইও ঐ সব কথায় কেন বল্—

সাঁঝের বেলা একলা ঘাটে,

তোর কেন লো বুক ফাটে . তুই কেন এত কথা কস্,—তুই ত অনেক কথাই জানিস্, মিন্‌সে যখন পাড়ি জমিয়ে ওপারে যায়, তখন তুই কোথায় ? শেখর যখন ঝড়ের রাতে সাঁতরায়, তুই ত বুক পেতে দিয়েছিলি, এখন কেন...যাক সে ভেসে গেছে, এ ভেসে এসেছে, যাক্ ভেসে গেছে ত ভেসেই যাক্, চলেছিস্ ত চলেই যা—তখন বুক পেতেছিলি কেন, এখন আবার বল্‌ছিস কেন, তুইও ভেসেছিস্ ভেসেই যা, সেও ভেসে গেছে ভেসেই যাক্,......আমি ভাস্‌তে ভাস্‌তে বুঝি চড়ায় ঠেকে গেলুম। কে জানে চূর্ণীর ঘুরণ পাকে যদি সবই যায়...যায় যাক্, সেত ফেলে দিয়েই গেছে। মাঝি যখন ফেলে গেছে, নৌকা ত তখন বানচাল হবেই চূর্ণী লো তোর ঘূর্ণী রেখে দে, আমার প্রাণের মাঝে সে, তোর ঘুরণে আর আমি চোবানি খাচ্ছি নি, আমি আর কাউকে ডরাই নি—আর কাউকে ডরাই নি! কিসের ভয়, কিসের লজ্জা, এ লজ্জাই আমার সুখ, চল্ তবে চল্,...চাঁদও আবার জলে ঢেউ দিতেছিস্, দে, দে, রূপের ঢেউ ত আমার কানায় কানায় চল্‌কে উঠেছে, তুই আরো ঢেউ তোল্, আমি ত দুলে দুলে উঠি...

রূপের ঢেউ লেগেছে গায়

মন আমার রূপ-সাগরে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়...

দে ঢেউ, দে ঢেউ, খুব ঢেউ তোল্...কল্ কল্ কল্ কল্...ভেসেই চল্...

(দূরে শেখর গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতে মারিতে অগ্রসর হইল)

ওই যে আকাশের চাঁদ, আর আমার গগনচাঁদ, আজ চাঁদ ধরতে চূর্ণীও বুঝি ফাঁদ পেতেছিস্ ..চূর্ণি! চূর্ণি! আমিও আমার রূপের আলোয় তোর বুকে ঢেউ তুলেছি, তার বুকেও তাই লো তাই! ... মরণ আর কি, গা খুলে কাপড় কাচ্ছি, আর যে বড় লুকিয়ে লুকিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখা হচ্ছে...লজ্জা সরম নেই বুঝি ...চল্‌না তখন—দেখাব এখন...

শে। স্রোতের জলে একরাশ পদ্ম ফুটে দুল্‌ছে তাই দেখ্‌ছিলুম্। আড়াল থেকে না দেখ্‌লে দেখার আশা মিটে না...ওলো চূর্ণী ভুলে যাবে লো, চূর্ণীতে আর আসিস্ নি, অত রূপ চূর্ণী আগ্‌লে রাখ্‌তে পারবে না লো...পার্‌বে না...

(জল হইতে উঠিতে লাগিল)

কা। যাও, যাও...মরণ আর কি...আর অত রস পাড়িয়ে কাজ নেই, কাজ নেই সর, এখন যাবে, না এই অন্ধকারে। (শেখর চুম্বন করিতে গেল) আ: কি কর...যাও... ..

শে। অন্ধকার ত অনেকক্ষণ কোন্ অন্ধকারে লুকিয়ে গেছে কাদি! দেখ্‌না তুই চলেছিস, চাঁদ তোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ছে দেখ্‌না তোর পায়ের পাতায় জল ঝর্‌ছে, তায় চাঁদ লুটিয়ে চুমু খাচ্ছে...

কা। আঃ কি কর যাও...পথের মাঝে...সর সর...

শে। কাদি! আমি পথ হচ্ছি, তুই মাড়িয়ে চলে যা—কাদি, ইচ্ছা করে তোর পায়ের নূপুর হই...তুই পা নাড়্‌বি আর আমি ঝুন্ ঝুন্ বেজে উঠ্‌ব।

(দূরে জনৈক লোক ক্লান্ত দেহে নগ্ন পদে তাহাদের দিকে আসিতে লাগিল...এক হাতে এক গাছা লাঠি, অন্য হাতে জুতা, এক পা ধুলা ও কাদা, পায়ের হাঁটু অবধি ধূলায়মাখা, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, মুখ গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে ভরা...পৃষ্ঠে বোঝার ভারে ঈষৎ নত...মুখে শীস্ দিতে দিতে আসিতেছিল)

কা। ওই পথে কে আস্‌ছে চল, চল, কি কর আঃ...

জ। হ্যাঁ গা এখানে কোথায় চটী আছে বল্‌তে পার, আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি (স্বগতঃ) হ্যাঁ এত সেই, এত সেই, এই ত...

শে। হ্যাঁ আছে...একটু আগে। (স্বগতঃ) রাজচন্দ্রের মত গলা, সেই নয় ত। সে ত অনেক দিন মরেছে শুনেছিলুম। (প্রকাশ্যে) তুমি কোথা হতে আস্‌ছ গা...

জ। আমি বিশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে আস্‌ছি, এখানে কোথাও চটী কি দোকানঘর পাওয়া যায় বল্‌তে পার...(স্বগতঃ) এত সেই...শেখর ছোঁড়া, এই শেখর আমার ছেলেবেলার এত বন্ধু ছিল...আধখানা খাবার কামড়ে মুখ থেকে খেতে দিত। তাই বুঝি প্রাণ স্বপ্নে থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে...

শে। হ্যাঁ আছে। আমাদের সঙ্গে এস, ওই যে বটগাছটা দেখ্‌ছ, ওই যে হে, যার খুব ঝুরি নেবেছে, ওই বুড় বট, ওইটে ছাড়িয়েই একটু ঘুরে গেলেই চটী, সেখানে সব খাবার দাবার পাওয়া যায়। (স্বগতঃ) রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! নিশ্চয় সেই...আমি, আমি, তাই ত, তাই ত,...বিদ্যুতের মত সব চম্‌কে দিলে অ্যাঁ...

(জনৈক লোকটি চলিতে চলিতে তাহার কোমর হইতে টাকার থলিটা আল্‌গা হইয়া পড়িয়া গেল...টাকা ও মোহর মাটিতে ঝন্ ঝন্ করিয়া ছড়াইয়া গেল...লোকটি ধীরে ধীরে কুড়াইতে কুড়াইতে—)

জ। কাদম্বিনী—বাঃ বেশ! নিশ্চয় সেই শেখর, অ্যাঁ আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল, কেন মর্‌তে, হায়! হায়! এই দেখ্‌বার জন্যে কি ফোঁটা ফোঁটা করে মাথার ঘাম পায়ে ফলে, এই করে, এই দেখ্‌তে এলুম? কে জানে...না—না—

বেশ, বেশ, বাঃ রূপ! রূপ! কে...কে! সেই রূপ!...

কা। (স্বগতঃ) তাই ত, এ মিন্‌সে কে গো, এত টাকা, ডাকাতি

টাকাতি করে আসেনি ত? শেষ কি আমি ফ্যাসাদে পড়্ব নাকি ...শেখর যে কি করে...

(কাদম্বিনী শেখরকে চোখের কোণে ঠারিয়া ইসারা করিল)

শে। তবে চল, এই এস আমাদের সঙ্গে—

কা। আঃ...দেখ (চাপা গলায়)...

জ। হ্যাঁ তোমরা, আহা তোমরা বড় ভাল লোক গো...আমার বড় উপকার করলে। (স্বগতঃ) ঠিক নিশ্চয়ই শেখর আমায় কিন্তু চিন্‌তে একেবারেই পারেনি...ভালই হয়েছে...একি! একি! (প্রকাশ্যে)...এদিকেও দেখ্‌ছি একটা বড় ঝট্‌কা হয়ে গেছে...(কথা কহিতে কহিতে সকলে প্রস্থান করিল)...

(দূরে চূর্ণী নদীতে তখন একখানা নৌকায় মাঝিরা ডাঁড় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেছিল)...

ওই জলের ওপর ঢেউ চলেছে
রগ্‌রগে চাঁদ ভাসে,
ঠিক সে যেন বুড়া নানি
ফোক্‌লা দাঁতে হাসে।
হেঁইয়ো হিস্—হেঁইয়ো হিস্...হা—হা...
হ্যাদে ওরে সুমুন্দির ভাই
মামীর পুত হালা
সামাল্ সামাল্ কইয়ো রে ভাই
ঝাঁকি দিবার পালা...
হেঁইয়ো হিস—হেঁইয়ো হিস্...হো—হো হা...

তৃতীয় দৃশ্য।

[ঘরের ভিতর কাদম্বিনী বসিয়া একটি পা আর একটি পায়ের উপরে স্থাপিত, জানুর উপর কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে—]

কা। কি আশ্চর্য্য, অত টাকা, অবাক করেছে, এ যেন আলাদীনের পিদ্দীম্। ওঃ অত টাকা যদি আমার থাক্‌ত, তা হ'লে কি হ'ত! কি আর হ'ত, ঢাল্‌তাম আর গুণতাম্, ঢাল্‌তাম আর গুণতাম, কুড়ি কুড়ি ক'রে থোকা দিতাম—তা হ'লে শেখরে আর আমাতে কি সুখই হ'ত—কি সুখেই থাক্‌তাম্...না না দূর, টাকায় কি সুখ হয়, টাকায় আবার সুখ কি...শেখরের মত অমন সোন্দর .সোন্দর! আঃ...শেখর! আমার শেখর!

(শেখরের প্রবেশ, মুখখানা একবার লাল একবার পীত রক্ত-শূন্য হইয়া যাইতেছে)

শে। লোকটা খেয়ে দেয়ে বুঝি ঘুমল...ঘুমল...বেশ ঘুমল, ঘুমুতে পার্‌লে—তুই! তুই! তুই! কাদি না? কত টাকা আছে জানিস, অনেক, অনেক, অনেক টাকা মোহর, অনেক! কাদি! কাদি! জানিস্ ও কে?...চুলোয় যাক টাকা, চিন্‌তে পারলি নি বুঝি? এ্যাঁ...এ্যাঁ...চিন্‌তে পার্‌লি নি,—চিন্‌তে পার্‌লি নি?

কা। শেখর, রাত যে অনেক হ'ল। শেখর! অমন করে কথা কইছ কেন, শেখর! শেখর! আমার ভয় কর্‌ছে, বড় ভয় কর্‌ছে, কে কাকে চিন্‌ব, কি করে চিন্‌ব...এ্যাঁ ..

শে। কাদি! তুই আমায় ভালবাসিস্ না?

কা। শেখর, আজ কেন ফিরে সে কথা, ভালবাসি কি না তাও আবার জিজ্ঞাসা করছ? শেখর, এই অন্ধকার রাত্রে সে...হা শেখর! সে রাত্রি কি ভোলা যায়!

শে। চুপ্, শুন্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে। দেয়াল ফুঁড়ে ভালবাসার আওয়াজ তার বুকে গিয়ে ধাক্কা দেবে...কাদি! তুই আমায় ভালবাসিস্ কাদি! কই? আর কা'র মুখ মনে পড়ছে না? না? আর কা'র মুখ? কাদি?

কা। কি বল্‌ছ, মনে আর মুখ ধর্‌বার যে একটুও ফাঁক নেই শেখর,

সে ভরে আছে। তোমায় ভালবাসিনি? আর কি করলে ভালবাসা জানান যায় বল, তাই করি, তুমি কি বলছ? তুমি কি এততেও সে কথা বোঝনি—

শে। না না সত্যি করে বল্, ভালবাসিস্? বল্ বল্!

কা। হাঁ শেখর! ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে খেলেছি, মাঠে মাঠে প্রজাপতি ধরে বেড়িয়েছি, বটগাছের কোটর থেকে শালিক পাখীর ছানা পেড়েছি, চূর্ণীতে হাঁসের মত দু'জনে সাঁত্‌রেছি, ফল্‌সা পেড়ে খেয়েছি, যখন যা বলেছ তাই করেছি। বড় হয়ে, জ্ঞান হয়ে, দেখলুম, আমার সে খেলার জুটী আমায় ছুটী দিলে। তারপর একরাত্রি অন্ধকারে আমার ...আমার...আমার সর্ব্বস্ব শেখর! তবু বলছ, তবু জিজ্ঞাসা করছ, ভালবাসিস্, কা'র মুখ বল...শেখর! কা'র মুখ মনে পড়্‌বে শেখর বল...সব মুখের দাগ যে আমার কাছে মুছে গেছে শেখর! শেখর! শুধু...শুধু...

(শেখরকে দুই বাহুদ্বারা লতার মত জড়াইয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল...শেখর তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল)

শে। সর! শোন্ তুই সত্যি আমায় ভালবাসিস্ তবে, তবে, যা বল্‌ব তা পার্‌বি বল্ সত্যি ভালবাসিস্? পার্‌বি বল্...

কা। বল কি কর্‌তে হবে বল শেখর, কি করলে বল শেখর! হা শেখর! এতদিন পরে তুমি উঃ...

শে। হাঁ! এতদিন পরে ওকে চিন্‌তে পেরেছিস—পারিস্‌নি—মরে ভূত হয়ে যখের টাকা মাথায় করে এসেছে, চিন্‌তে পারিস্‌নি ...ও তোর—ওকে খুন করতে হবে...ও তোর সেই বর রাজচন্দ্র...

কা। (চমকিত হইয়া লাফাইয়া) ওঃ...(দুই হাত বক্ষে চাপিয়া) শেখর! উঃ...না-না-না শেখর! তুমি কি মানুষ—না-না

এত সৌন্দর্য তুমি, শেখর, না-না তুমি মানুষ! না-না-না শেখর, তুমি আমায় ভালবাস না শেখর! না-না-না সে নয়...

শে। হ্যাঁ সেই! তুই খুন কর্‌বি কিনা বল্—

কা। শেখর! তুমি আমায় মেরে ফেল, শেখর তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় মেরে ফেল—তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই ...উঃ শেখর! তুমি আমায় মেরে ফেল...

শে। এই তুই আমায় ভালবাসিস্ না? এখন বল্ খুন কর্‌বি কি না, ভালবাসিস্ এই তোর ভালবাসা—বল্ বল্ বল্ তোকে কর্‌তেই হবে...ভালবাসিস্ তার প্রমাণ দে...

কা। শেখর! শেখর! আমি মেয়ে মানুষ, তবু তবু, শেখর এতেও তোমার আশা মিট্‌ল না, শেখর, আচ্ছা বল—কি? খুন খুন খুন হাহা হাহা...আচ্ছা কর্‌ব, কর্‌ব, শেখর, আমায় ত্যাগ কর্‌বে না...এ্যাঁ ত্যাগ কর্‌বে না এ্যাঁ...

শে। নে এই ছোরা ধর্—সে ঘুমুচ্ছে...এই সুযোগে...মার্‌তেই হবে ...নইলে আমি ভালবাস্‌ব না, কাদি! সেই...সেই...ওঃ সেই ...ধর্ ..

কা। দাও...দাও ..শেখর! আমায় ত্যাগ কর না, ত্যাগ কর না—

(কাঁপিতে কাঁপিতে ছোরা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল—)

শে। রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! তুমি থাক্‌তে আমার সুখ নেই, কাদিকে বিয়ে করে বড় দাগা দিয়েছিলে, সে ঘা শুখতে দিতে তোমার বুক করকরিয়ে উঠেছে না? আবার মরে দানা পেয়ে এসেছ...রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র!

(কাদম্বিনী কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল—)

কা। শেখর! শেখর! না-না-না ওই চাঁদের আলোয় কে হাতছানি দিচ্ছে, না-না চল আমরা চলে যাই...শেখর! চল তোমাতে আমাতে একযোড়া পায়রার মত ওই চাঁদের আলোয়

উড়ে যাই...শেখর! আমার হাত কাঁপ্‌ছে, শেখর আমার পা কাঁপ্‌ছে...শেখর! সে যে রোগের সময় আমাকে বুকে করে সেবা করেছে, শেখর! না-না-না আমি যে মেয়েমানুষ ...শেখর! না-না-না তুমি বড় সোন্দর—শেখর? চল আমরা ...চল আমার কোথাও চলে যাই...

শে। চুপ্‌...তোকে বুকে করে, হ্যাঁ! হ্যাঁ! সেই বুকে ছোরা বসাবি কি না বল্‌, বল্‌ বল্‌ এখন বল্‌ কাদি! কাদি!

কা। শেখর! শেখর! যাব...হ্যাঁ হ্যাঁ যাব, যাব শেখর, আমায় ত্যাগ কর না...আমায় ত্যাগ কর্‌বে না শেখর?

(কাদম্বিনী কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে নিজেকে সামলাইয়া চলিয়া গেল...(নেপথ্যে "শেখর আমায় ত্যাগ কর না...আমায় ত্যাগ কর না")...

শে। হাহা—হাহা—রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! ওই! ওই! ওই! ছোরার ঘা পড়্‌ল, ওই ছোরার ঘা পড়্‌ল, ওই! ওই! ওই! রক্ত! রক্ত! রক্ত! বড় কাদিকে বিয়ে করেছিলে—বড় কাদিকে বিয়ে করেছিলে...ওই ঝলকে! ঝলকে! ঝলকে! হাহা হাহা...

(নেপথ্যে..."শেখর! আমায় ত্যাগ কর না"... শেখর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

[চটীর ঘর...এক কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে···ঘরের তিন ভাগ অন্ধকার, একভাগে আলোক...একটা বাদলা পোকা সেই প্রদীপের আলোয় উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে...রাজচন্দ্র শয্যায় শায়িত]

রাজ। আমি ভুল করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, শেখর কাদম্বিনীর মিলন হয়েছে, আমিই ভুল করেছি, এক বোঁটায় দুটো ফুল ফুটতে যাচ্ছিল, আমি ভুলে ছিঁড়ে ফেলেছি—আমি ত

তাদের কাছে মৃত...মৃত...মৃত, তবে কেন তাদের এ সুখের পথে কণ্টক হয়ে রই...কাদম্বিনী সুন্দরী, শেখরও সুন্দর। সুন্দরে সুন্দরে মিলন সেই ত বেশ...আমার মত ত এমন কুৎসিত নয়, আমি কুৎসিত! কুৎসিত! তাই ফুল না ফুটতে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম—আমি কেন তাদের মধ্যে আবার এমন করে এলুম, ভুল হয়ে গেছে, না আমার ভুল হয়ে গেছে...এ পথে আর না আসাই ভাল ছিল—কটা বছর ত কাটিয়েছি, আর কটা দিন না হয় কটা বছরই, তাও বেশ কেটে যেত—না এ পথে আর না আসাই ছিল ভাল, ছিল ভাল আর যদি এদের সঙ্গে দেখা না হ'ত। ছিল ভাল যদি আমাকে আজ সংসারে না থাক্‌তে হত...উঃ এত দূর! কিন্তু আজ যে এত টাকা রোজগার কর্‌লাম, কার জন্যে, কার জন্যে—এ ত সবই কাদম্বিনীর জন্যে—তবে সেইগুলো গুণে দিয়ে চলে যাই না কেন—দিলেই ত পিপাসা মিটে যায়,...দেওয়াই সুখ, দেবার জন্যেই ত এত কষ্ট করেছি, তাকে দেবার জন্যেই ত এই ছটা বছর এত কষ্ট করে, না খেয়ে, এই টাকার সংগ্রহ...টাকার জন্য সে কেঁদেছিল, সে চিন্‌তে পার্‌লে না, নাই পারুক, আমি ত তাকে ভালবাসি... তবে কাদম্বিনী যদি শেখরকে নিয়ে থাক্‌লে ভাল থাকে, তার তাই ভাল, আমার মাঝে থেকে এ কেন তবে...তাই করি। দিলেই যদি পিপাসা মেটে...তবে আমারও পিপাসা মিটুক, তাদেরও পিপাসা মিটুক...তাই করি, না জানিয়ে চলে যাই, টাকাগুলো এইখানে রেখেই চলে যাই, আর আমার টাকায় কি কাজ, কিছু না—পিপাসা মিটেছে, টাকার পিপাসা মিটেছে, প্রাণের পিপাসাও ত মেটবার রস এসেছে, তবে আর কেন, আমি এখন বেশ বুঝ্‌ছি, এই দেওয়াই সুখ এরই জন্যই আমার আসা...অশান্ত মন শান্ত হও...দুর্ব্বল হয়ো না, তুমি পুরুষ, পুরুষের মত, আকাশের মত উদার হও—তারা যে

দুর্ব্বল, তারা যে নিজেদের ভাল করে বোঝেনি, তাদের সুখের পথে তবে কণ্টক কেন হও, কেন, কেন, বিচ্ছিন্ন করবে—বেশ ফুটেছে, বেশ ফুটেছে, বাঃ রূপে রূপ মিশেছে বাঃ ..বাঃ...তবে ..ওকি কাদম্বিনী অমন করে আস্‌ছে কেন? ...আমি চুপ করে শুয়ে থাকি...আমায় কি চিন্‌তে পেরেছে, তাই আস্‌ছে, তাই বোধ হয় তাই...

(ছুরিকা হস্তে কাদম্বিনীর প্রবেশ...বুকের বসন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, মাথার কেশ ধূলায় লুটাইতেছে—)

কা। শেখর! শেখর! তুমি আমায় ত্যাগ কর না, আমি করব, করব, খুন করব...ওই যে গাঢ় নিদ্রায়...সেই-ই ত ঠিক...তবু তবু—না না—আমি যে মেয়েমানুষ—বিশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছে, বড় ক্লান্ত, ঘুমুচ্ছে—ঘুম ভাঙ্‌তে আর দেব না, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না—নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না—অ্যাঁ নইলে শেখর বুকে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, উঃ শেখর! না খুন না করলে ভালবাস্‌বে না। ও আমায় বিয়ে করেছিল, খেতে দিতে কষ্ট হ'ত। না খেয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়ী খেয়েছি বলে আমায় সব ভাত খাওয়াত...আর আমি? শেখর! শেখর! শেখর! না আমায় ত্যাগ কর না। শেখর আমি কি করব ...করব...বেশ ঘুমুচ্ছে...শুধু নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে—শুধু নিশ্বাস...আঃ পিদীমটা যে সাক্ষী হবে। অ্যাঁ বিয়ের সময় অমনি একটা পিদীম সাক্ষী ছিল...দূর ছাই...পিদীমটা নিবুলেই হয় ...তারপর...তারপর...

ওকি! বুকের ওপর সেই লেখা...কি কি—সে বুকে কাদির নাম লিখে, বুক খুলে, বুক পেতে শুয়ে রয়েছে, আর আমি...অ্যাঁ...অ্যাঁ ...আমিই না—আমিই না ওই...ওই যে বিয়ে করেছিল গো...ওই লেখা, ওই আমিই ত তার বুকে—এখন নয়? না-না-না, আমি তার বুকে কেন ওইখানে, ওইখানে, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না...

শেখর! শেখর! আমি করব, খুন কর্‌ব্‌, নিশ্চয় খুন কর্‌ব। তোমার জন্তে—তোমার ভালবাসার জন্যে—না শেখর ভুল, তুমি না হলে আমার চল্‌বে না...ও রূপ না হলে জীবন বৃথা—আমার জন্তেই খুন কর্‌ব,... আমার জন্তেই খুন কর্‌ব...ওই যে শুধু নিশ্বাস—পিদীমটা নিবুলেই হয়...পিদীমটা ত নিবুলেই হয়—তবে—তবে...

(অঞ্চলে প্রদীপ নিভাইয়া ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল... একবার এগিয়ে আসে, নিশ্বাস ফেলে, একবার পিছনে ফিরে...)

(প্রদীপের সলিতাপোড়া উগ্রগন্ধে রাজচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল—)

রা। আমায় খুন কর্‌বে, করুক্‌, জীবন পাবার সময়ও নিজের হাত ছিলনা, মৃত্যুর সময়ও বা বুঝি হাত থাকেনা, তবে কেন? আমার জীবন পেলে যদি কাদম্বিনীর সুখ হয় হোক্‌...এ জীবনের মূল্য কি—কিছু না, একটা নিশ্বাস, একটু রক্তের রাঙা, আর ত কিছু নয়? তবে? শুধু চেয়ে চেয়ে দিয়ে ভুলে যাওয়া, তারপর আঃ এ ত বেশ...

কা। না—না মার্‌তে পার্‌ব না, মায়া হচ্ছে, কিসের মায়া, কার মায়া, আমার পায়ে একদিন কাঁটা ফুটেছিল, ও আমার পায়ের সেই কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দিয়েছিল...না—না—না মার্‌তে পার্‌ব না—না—পার্‌ব না—ওই যা ভুলে যাচ্ছি—না পার্‌ব, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না...শেখরকে বুকে পাব না, অ্যাঁ—না, আমি পার্‌ব পার্‌ব...

(ভয়ানক জোরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল···একটা পাপিয়াও দূরে ডাকিয়া উঠিল...ঠিক সেই সময়ে চাঁদ ঘুরিয়া জানালার ভিতর দিয়া রাজচন্দ্রের শয্যা প্লাবিত করিয়া দিল। রক্তবর্ণ চন্দ্র দিক্‌প্রান্তে মাঠের শেষে ডুবিতেছে)...

কা। ওই যে, ওই...লেখা, কাদি ওইখানেই...তবে...তোমার জন্তে শেখর ওই...ওই...

(রাজচন্দ্রের বুকে ছুরিকা আঘাত)

রা। আঃ...নাও—নাও—প্রাণ নাও—আমার পিপাসা মিটেছে, তোমরা জন্ম জন্ম সুখে থাক...

কা। অ্যাঁ! আঁ! আমার জন্যে সুখ—সুখ—শেখর! শেখর!

(শেখরের প্রবেশ)

শে। আমি শুধু এই ঘোর ঘোর আলোয় একবার দেখ্‌ব—একবার দেখ্‌ব, হয়েছে, হয়ে গেছে অ্যাঁ...

কা। শেখর! একটা চুমু দাও, শেখর! একটা চুমু দাও।

শে। হাহা...হা হা...কাদি! কাদি! কাদি! বাঃ রাজচন্দ্র বাঃ...

(ছুরিকা হস্তে কাদম্বিনী—তাহার হাত রক্তে প্লাবিত...শেখরকে আলিঙ্গন করিল, শেখরের গাত্রে রক্ত লাগিল) ..

কা। শেখর...শেখর...আমার খোঁপাটা বেঁধে দাও, চুলটা খুলে গেছে। শেখর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার ভালবাসার মুকুট আমায় পরিয়ে দাও!

(শেখর, কাদম্বিনীর চুল চূড়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিল...তখন পূর্ব্বদিক দিয়া প্রভাতের রক্তাভা মাঠের উপর দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল...)

শে। একি! একি! সর্...সর্...সর্ তুই রাক্ষুসী...সরে যা, সরে যা...উঃ...উঃ ..সরে যা...হাহা হাহা রক্ত...রক্ত...রক্ত... রক্তের আবার ভালবাসা কি, সে বড় গরম...না—না—সরে যা, সরে যা...(ঠেলিয়া দিল)

কা। শেখর! শেখর!

শে। সরে যা—সরে যা—শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নি...ওই চূর্ণী কি বল্‌ছে? ওই শোন্ শোন্ শোন্ রাক্ষসী কান পেতে শোন...হাহা... হাহা...

(দূরে মাঝিরা তখন সারি গাহিতেছিল—)

ওই কাল জলে ঘূর্ণী ওঠে

আগুন জলে যায়,

ওই রাঙা সূরয রাঙা আঁখি
নয়ান মেলি চায়

হেঁইয়ো হিস্ হেঁইয়ো হিস্ হো...হো...হা...

ওই শোন নয়ন মেলে কি চায়...কে ?...কে কে...দেখ্ছিস্ নি, কার চোখ...ওই দেখ, কার চোখ, কার চোখ, ওই চূর্ণীর জলে—কাল জলে—কার চোখের আলোয় আলো করা চোখ ! ওই ! ওই !

কা। শেখর ! একটা চুমু দাও, শেখর ! একটা চুমু দাও।

শে। সরে যা, সরে যা, চিন্‌তে পেরেছি—আলোয়...আলোয়...চিন্‌তে পেরেছি—ওই চূর্ণী ডাক্‌ছে—আলোয় চিন্‌তে পেরেছি, আমি চূর্ণী সাঁত্‌রে তোকে নিয়েছিলুম—চূর্ণী ফির্‌তে বলেছে—ওই ! ওই ! বুঝেছি বুঝেছি সেই রাত্তির, সেই রাত্তির, সেই অন্ধকারে সেই স্পর্শের কাঁটা এখনও ফুটে রয়েছে...হো হো সরে যা,...সরে যা...কার নয়ন—সাড়া পড়েছে—কার ডাক্ ...হো হো !

কা। শেখর ! শেখর ! আমি যে তোমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি...

শে। ছাই ছাই...ছাইয়ের আবার ভালবাসা..ওই বুকে ছোরার ঘা ...ছোরার আবার ভালবাসা ! সরে যা...সরে যা...

কা। শেখর ! তুমি বড় সোন্দর, শেখর ! শেখর ! বড় সোন্দর আমার শেখর, ভালবাসি, বড় ভালবাসি, শেখর, একটা চুমু দাও...শেখর, একটা চুমু দাও।

শে। না—না—না, সরে যা, সরে যা, ওই চূর্ণী ডাক্‌ছে, সরে যা, আমি সাঁত্‌রে এসেছি, সাঁত্‌রে বাড়ী যাব—সরে যা, সরে যা...

কা। শেখর ! প্রাণের শেখর ! তবে যাও, তবে যাও ...শেখর ভালবাসা চেয়ে চেয়ে, পেয়ে পেলাম না, তবু তুমি মন বুঝ্‌লে না—তবে যাও শেখর, তবে যাও শেখর, আমি কি

কর্‌লুম শেখর, আমি কি কর্‌লুম...না তবে যাও, না একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—একটা চুমু—শেখর! একটা চুমু!

(কাদম্বিনী নিজের বুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া পড়িয়া গেল... কাদম্বিনীর বুকের রক্ত ফিন্‌কি দিয়া শেখরের চোখে মুখে লাগিল... শেখর তাহার দুই হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধে তাকাইল। চূর্ণী নদীতে তখন মাঝিরা সারি দিয়াছে...)

ওই খাজুর বনে রোদ উঠেছে
ফিঙা ডাকে পারে,
ওই বনের ফাঁকে আঁধরি কাটে
চা না ঘাটের ধারে—
ঘোমটা সরে গেছে নানির
নোলক দোলে নাকে,
তায় বাঁকা আড়ে নজ্‌রা মারে
দেখ্‌না ডাকে তোকে।
ওই জলের ভেতর ডাক্ দিয়েছে
শোন্‌রে মাঝির পোলা...
সামাল, সামাল, কইয়ো রে ভাই
ঝাঁকি দিবার পালা—
হেঁইয়ো হিস্...হেঁইয়ো হিস্...হেঁইয়ো হিস্—হা।

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

———

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২২

কিশোর-কিশোরী

(১)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন-তলে,
নব-শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !

সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !
সে কোন কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে !
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে !
ওগো ফুল ! ওগো মিষ্ট !
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট !

কা'র ডাকে ছুটে এ'নু ?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথমবার সাঁঝের আঁধারে।

(২)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন দেবতা ?
কে শুনিল কাণ পাতি শ্যাম দুর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই।
তুমি শুনেছিলে কিছু ?—আমি শুনি নাই!

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম দুর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মূরতি ?
ধ্বনিয়া উঠিল কিগো মেঘমন্দ্র রবে,
সন্ধ্যার আরতি ?
আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই,—
তবে কা'র ডাকে তুমি চলে এসেছিলে ?
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহাপরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে ?
জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কা'র বাঁশী বাজে ?—
নির্ব্বাক নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,

শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম দুর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায়?
তুমি কি অবাক হয়ে শুনেছিলে তাই?
আমি ত' শুনিনি কিছু—কিছু বুঝি নাই।
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে,
আকুল সন্ধ্যায়,
সেই সে প্রথম দিন!—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ মুরতি তব! কাহার লাগিয়া,
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কে'বা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা!

(৩)

আমি কেন ছুটে এ'নু? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি!
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমাতেছিল—সে যেন জাগিল!
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে?—তুমি কি বোঝনা,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হ'তে?—আমি জেনে শুনে এসেছিনু,

মোহিনী মুরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল-পরবশ বাসনার ভরে ?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে ?
সৌন্দর্য্য সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে ?
চাও মোর আঁখি পানে ও কথা ভেবনা,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা ?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে ? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁপিত সেই যে চির-সুন্দর :—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হয়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,

আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত !
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত !—
সে ফুল তরঙ্গে ;—কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে ?—
আঘাতি হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল রাশি ! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।

কিশোর-কিশোরী

যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত!—
তাহারি কল্পিত বুকে মোরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে; মূরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া।
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে। ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম আসিবে সে, ধরিব তাহারে :—

সে চির সুন্দর মোর, নাই আর নাই!
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই!
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটেনা তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হয়ে! কাঁপেনা অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয়না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু কেহ আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কানের কাছে;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের।
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,

তোমা দেখিবার আগে! তোমার লাগিয়া
ছিলনা পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া!
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগন তলে,—সাঁঝের মাঝার।—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধ'ম!
অই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা
সুখসূর্য্য-কর-স্নাত কুসুম সমান;
করুণায় ভরাভরা অই যে নয়ান!—
তার কথা শুনি নাই;—ওগো মর্ম্ম-লতা!
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা!

তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
সুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল!
জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমনে জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখাপরে জ্বলিনু তখনি!

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে;—এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব প্রাণে, সর্ব্ব মনে ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে?—কেবা জ্বালাইল?

যে সীতা অশোকবনে রামবিরহে নিরন্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা ;—সে সীতাকে উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধবর্ণনায় কাব্য হয় না ; তাহা হইলে আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত! সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোকবনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই অশোকবনেই সীতাচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোকবনে লোকনয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত একাকিনী সীতার যে দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানরসেনার সহায়তায় রামলক্ষ্মণের লঙ্কাযুদ্ধ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। এই অশোকবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সীতা আজ যশস্বিনী,—রামলক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্বিনী। এই অশোকবনেই রাবণের কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা! এই অনল যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার পক্ষে, পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। তাই বলিতেছিলাম যে, অশোকবনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধকাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে ;—নিতান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায় রেখায়, বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের ঘটনা অবলম্বনে যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতাচরিত্র চিত্রণ করিতে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিকেই চিন্তাকুল হইতে হয়। মধুসূদনও চিন্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্যকলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গারম্ভে যে সুন্দর বাল্মীকিবন্দনা আছে, তাহা কাব্যের একটা নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলী বন্দনা নহে ;—তাহা

সীতাচরিত্র চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারম্ভে সরস্বতীবন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন;—পরে আর কোন সর্গারম্ভেই বন্দনা নাই; —গ্রন্থমধ্যে কেবলমাত্র অশোকবন নামক এই চতুর্থ সর্গারম্ভে কবি শঙ্কিতহৃদয়ে বাল্মীকিবন্দনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গুরুত্বব্যঞ্জক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলেন;—

"তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

তখন তিনি "দীন", "দূর" ও "তীর্থ" এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনাশেষে বলিয়াছেন;— "কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।" কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন না, কবি অশোকবনে সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন লোকে দুর্গানাম করে; দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন লোকে দ্বারদেশে নমস্কার করে; তেমনই অশোকবনের চিত্র উদঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে কবির এই বন্দনা, এই কৃপাপ্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যকলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পূর্ব্বে কবি আর একটু কাব্যকলা-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেকে ম্রিয়মাণ লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব। অশোকবনের চিত্র উদঘাটনের পূর্ব্বে কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন;—দেখাইয়াছেন—

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,—
"সুবর্ণদীপমালিনী—রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা ;"—

গৃহে গৃহে আলোকমালা, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি, এবং সর্ব্বত্র বিজয়াশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই কবি অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিলেন,—যেখানে আলোক নাই, আশা নাই, আনন্দধ্বনি নাই,—সেই আঁধার ও নীরব অশোকবনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) যেমন চিত্রকলার, তেমনি কাব্যকলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন ;—

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে কাঁদেন
রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে নীরবে"—

তখন পাঠকের মনে সেই অশোককাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া দিয়াছে ; পবন রহিয়া রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ;—পক্ষীকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে ;—প্রবাহিনী উচ্চ বীচিরবে সীতার শোকবার্ত্তা বহন করিতেছে ;—সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোকবনের চিত্রে সীতাহৃদয়ের দুঃখচ্ছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া তুলে।

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাত্র-পাত্রীদের প্রতি কখনও নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হন, আবার কখনও বা সহৃদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ অবস্থায় নির্দ্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্ অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যকলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া সীতা এই অশোকবনে রাবণকর্ত্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লঙ্কাযুদ্ধ অবসানপ্রায়। বীর-

যোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া, আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে, লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে করিতে, রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন ;—

"কি কুক্ষণে পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে
আমি আনিনু এ হৈম গেহে!"

রাবণের চক্ষে সীতা আজ "পাবকশিখা-রূপিণী!" এখানে রূপের "রূপিণী" নহে,—রূপকের "রূপিণী" ;—পাবকশিখা-স্বরূপিণী—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা! যাহার গৃহদাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে যে চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন! "আনিনু" বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। লোকের গৃহে আগুন লাগে; দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকুও নাই ;— দৈবাৎ নহে ;—তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন! এখন রাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। এখন আর রাবণকর্ত্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্যকলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপীড়ন না হইতেছে এমন নহে ;—সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই; কারণ লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা। এদিকে সীতার মনের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী! লক্ষ্মণ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন! ইহাতে দুর্ভাগিনী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদ ;—তারপরে, এখনও স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ শোকতপ্ত ও নিরাশ হৃদয়ে

সান্ত্বনাবারি সেচন করিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন।

"দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া ফেরে দূরে
মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—হীনপ্রাণা
হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী, নির্ভয় হৃদয়ে
যথা ফেরে দূরবনে।"

সান্ত্বনার প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়-আঁধার অশোকবনে ক্ষণেকের জন্য একটা শান্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন;—

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন!

ভীষণ আঁধার, যেন প্রেতপুরের ন্যায়! ভীষণ নীরবতা,—জনপ্রাণী নাই,—সীতা একাকিনী! এমন সময়ে,—সান্ত্বনার এই সুন্দর অবসরে—

"সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে!"

সমবেদনা ও সান্ত্বনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, চক্ষে অশ্রুভার এবং হস্তে সিন্দূর লইয়া, "পা দুখানি" পূজা করিতে আসিয়াছেন। অশ্রুর সহিত অশ্রু,—ইহাই ত প্রকৃত সমবেদনা; আর, সতী নারীর এমন বিপদে সিন্দূরই ত সুন্দর সান্ত্বনা। তাই সরমা সমবেদনা ও সান্ত্বনার এই দুইটি উপাদান লইয়া আসিয়াছেন। সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরে এই দুইটি জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য;—সমবেদনায় অশ্রুমোচন করে, সীতার পক্ষে লঙ্কায় আর কে আছে? এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া এমন বিপদের দিনে মনে আশা জাগাইয়া দেয়, এমনই বা আর কে আছে? "অনুমতি" লইয়া সরমা সযত্নে সীতার সীমন্তে সিঁদূরের কৌটা দিয়া "পদধূলি" লইলেন! রেথায় রেথায় সীতার দেবীভাব

পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। তারপর যখন পদধূলি লইয়া সরমা বলিলেন—

"ক্ষম লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ;"—

তখন বোধ হইল, যেন অধম মানবী দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

"এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ;"

সরমা সীতার পদতলে বসিলেন ;—পার্শ্বে নহে, "পদতলে"! সীতার দেবীভাব ফুটাইবার জন্য কবির কি যত্ন! কিন্তু ইহাতেও কবির মনস্তৃপ্তি হইল না ;—তাই কবি উপমা দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ!"

এতক্ষণ রেখায়-রেখায়, বর্ণে-বর্ণে যে দেবীচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই উপমা দ্বারা যেন সেই চিত্রে finishing touch দেওয়া হইল। হিন্দুর হৃদয়ে দেবীভাব ফুটাইতে এ তুলনার আর তুলনা নাই। তুলসী হিন্দু গৃহস্থের অন্তর্প্রাঙ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেও হয় ; আর তুলসীমূলে দীপদান, হিন্দুগৃহের প্রাত্যহিক সান্ধ্য উৎসব ;—কারণ, তুলসী "দেবী", তুলসী "বিষ্ণুপ্রিয়া"।

সুবর্ণ প্রদীপের সহিত উপমায় সরমার রাজৈশ্বর্য্য ও উজ্জ্বল রূপ সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে। সেই সুবর্ণ প্রদীপ আজ তুলসীর মূলে জ্বলিয়া সার্থক হইল। ধনীর গৃহে সুবর্ণ প্রদীপ থাকে, কিন্তু তাহা সংসারের কোন কাজেই লাগান হয় না ;—রন্ধন-গৃহে নয়, শয়ন-গৃহে নয়, বৈঠক-খানাতেও নয় ;—সে সোনার প্রদীপ কাজে লাগে কেবল দেবদেবীর পীঠতলে ; আর তাহাতেই সেই সুবর্ণ প্রদীপের সার্থকতা। আজ সরমাও সেইরূপ সীতার পদতলে বসিয়া সার্থক হইলেন। রূপ

ও ঐশ্বর্য্যকে পবিত্রতার পদতলে বসাইয়া পবিত্রতার মাহাত্ম্য যেন চিত্রিত করা হইল! এই একটি উপমায় কবি সীতাকে কত উচ্চ আসনে বসাইলেন! অশোকবনে সীতা পাঠকের চক্ষে যেন মূর্ত্তি-মতী পবিত্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন!

তারপর, যখন সরমার অনুরোধে সীতা তাঁহার হরণ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি বলিতেছেন ;—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী ;"—

হিন্দুর মনে গঙ্গার পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ, তাহা না বলিলেও চলে। সেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান "গোমুখী" এবং সেই জন্যই উহা এক পবিত্র তীর্থস্থান। এমন পবিত্র তীর্থ গোমুখী-গুহার সহিত সীতামুখের এবং ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ স্বরে তন্নিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র বারিধারার সহিত সীতাকথিত স্বীয় পূর্ব্বকথা-পরম্পরার উপমায়, সীতা ও তাঁহার জীবন-কাহিনীর পবিত্রতা চরমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখন দেখুন, হিন্দুর দুটি মহা পবিত্র জিনিসের সহিত উপমা দিয়া, কবি কেমন সহজে ও সুন্দররূপে সীতার ও তৎকথিত কাহি-নীর পবিত্রতার ভাব হিন্দু পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন ;— তুলসী ও গঙ্গার বারিধারা! ঐ দুইটি জিনিসই হিন্দুর মনে পবিত্রতা ভাবের Symbols স্বরূপ। সরমা প্রথমে সেই তুলসীমূলে স্বর্ণ-প্রদীপরূপে সার্থক হইয়াছেন ;—এখন আবার গঙ্গার পবিত্র বারি-ধারা পান করিয়া মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। দুটি মাত্র উপমায় সীতার পবিত্রতার ছবি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কাব্যকলার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

তারপর, কবি সীতার পঞ্চবটীবাসের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশে বড়ই সুমধুর ও সুন্দর। আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের রীতিই এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই তাহাতে প্রসন্নতা বিরাজ করে। তাই সীতা বলিতেছেন ;—

"দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ?"

রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ হইয়াও, তিনি এই দাম্পত্য-প্রেমের প্রভা-বেই পূর্ব্বের রাজসুখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু যে ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহা নহে ;—ক্রমে এই বনবাসের সুখের তুলনায় পূর্ব্বের রাজসুখ তাঁহার কাছে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে কুটীরের চারিদিকে নিত্য প্রস্ফুটিত ফুলকুল! প্রভাতে কোকিলের পঞ্চম স্বরে জাগরণ! কুটীরদ্বারে শিখীসহ সুখিনী শিখিনীর নর্ত্তন! করভ করভী মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলা-হারী অতিথি! নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশসজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অঙ্গসজ্জা করি-তেন; তখন রাম তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষণ করি-তেন! রামের পক্ষে ইহা কৌতুক-সম্ভাষণ হইতে পারে; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই "বনদেবী" ;—রাজরাণী কোথায় ইহার কাছে লাগে ? বনবাসের এই সুখের কথা শুনিতে শুনিতে, সরমার মত, পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে ;—

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজসুখে।"

এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য প্রেমিকতার সঙ্গে তাঁহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। মধুসূদন যেন তাহারই সার-সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভব-ভূতির সীতার ও কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া মিলাইয়া, বনবাসিনী সীতাচিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র পৃষ্ঠায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের এমন একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোকবনবাসিনী সীতার মুখে তাঁহারই পূর্ব্ব সুখ-

স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রু-জল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়; করুণরসের নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মাধুর্য্যরসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায়;—অশোকবনে সীতার মুখে তাঁহার পঞ্চবটীবাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে। পঞ্চ-বটীর এই সুখ-শান্তির কথা বলিতে বলিতে, যেই রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছ্বাস সেই সুখের কথাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।—

"সাজিতাম ফুলসাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।"—

বলিয়াই, সীতার শোকতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল;—

"হায় সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

তখন, সরমার সান্ত্বনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল,—

"শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা!"—

অমনি শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—

"এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—

বলিয়া সীতা নীরব হইলেন। পরে সরমার সান্ত্বনায় আবার পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! এরূপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে, এবং সরমা সীতার কাছে আসিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোকবনে সীতা ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মূর্ত্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সান্ত্বনার মূর্ত্তি ধরিয়া, পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে হইলেই সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়ে;—শোক ও সান্ত্বনা একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে! মেঘনাদবধকাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্ত্তি এবং ইহার চিত্রণে তাঁহার কাব্যকলার অসাধারণ স্ফূর্ত্তি!

সীতাহৃদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন শুনুন;—

সীতাকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন;—

"নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"

রাবণ "দুষ্ট" হইলেও তিনি এ দোষে দোষী নহেন। সুতরাং সীতা

রাবণের প্রতি-আরোপিত এই দোষের ক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন হেতু।"

রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (charity) মধুসূদনের কীর্ত্তি।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতাচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে রাম ধাবমান হইয়া দূরবনে গিয়া পড়িয়াছেন ;—কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্মণ। সীতা সহসা দূরাগত আর্ত্তনাদ শুনিলেন ;—

"কোথারে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে?"—

সীতা বিচলিত হইয়া লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রামের বাহুবল অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সঙ্কুল বিজন-বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা লক্ষ্মণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমাদের কুণ্ঠা হয়। মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘকাল লঙ্কার অশোকবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল! মানবচরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই কটূক্তি সম্বন্ধে বাল্মীকিকে সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামায়ণের সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনিয়াছি, তখন আমাদের কানে ঐরূপ কটূক্তি বেজায় বাজে। মধুসূদনেরও বাজিয়াছিল। তাই, তিনি সীতার মুখে অশ্রাব্য

কটূক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য করিলেন।

> "সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
> কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
> নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
> হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
> জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।
> রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
> দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
> দূরবনে!"

লক্ষ্মণের ন্যায় বীরের প্রতি "রে ভীরু," "রে বীরকুলগ্লানি," বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে "যাব আমি," বীর লক্ষ্মণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই ;—তীক্ষ্ণ হইলেও, ইহা মর্ম্মঘাতী নহে ;—ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমারেখাটুকু মধুসূদন ক্ষালন করিয়া উৎকর্ষ সাধনই করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সীতাচিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্যকলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহার অন্যতম। তখন সীতার চক্ষে জগৎ অন্ধকার ; কোথায় যাইতেছেন, তার ঠিক নাই ;—রামলক্ষ্মণের কেহই জানিলেন না ;—বিজন বন, কেহই দেখিল না ;—ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার! তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ;—কিন্তু শুনিবার লোক কই? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গের অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন ;—কিন্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন ;—কিন্তু সে ত মনের আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকূল সমুদ্রে

ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একান্তই নৈরাশ্যময়? মানবমনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই করুণ কাব্যকলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;—অতি সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন;—

"এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধিব!"—

তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে;—

"কাঁপিলা বসুধা, দেশ পূরিল আরাবে!"

সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন;—

"শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার! দাসী পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি মৈথিলী!
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ্ চেয়ে।"

অকুল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূর প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হৃদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscopeএর মত করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চবীরের মিলন হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা দেখিলেন। রাবণবধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, সীতাকে লইয়া যাইতেছেন;—তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন;—

"হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!"

ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে সীতার মোহভঙ্গ হইল;—সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল! জাগিয়া সীতা দেখিলেন,—যে রাবণ, সেই রাবণ! আর জটায়ু,—

"ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!"

আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য!—যে অকুল সমুদ্র, সেই অকুল সমুদ্র! কিন্তু তবু এই স্বপ্নে একটা আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য; তাহাও আবার জননী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত!—ইহা স্বপ্ন হইলেও, মিথ্যা হইবার নহে। নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে সীতা, বোধ হয়, এই আশার স্বপ্ন অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন

অমূল্য। তাই এই স্বপ্নকাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন ;—

"শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্বকাহিনী !"

সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এপর্য্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে ; সুতরাং আর যাহা বাকী, তাহাও ফলিবে ;—এইরূপ সান্ত্বনাও দিলেন। শেষে বলিলেন ;—

"আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুল না দাসীরে সাধ্বি ! যতদিন বাঁচি
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা !"

বিদায়কালে সরমার এই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত ! যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল ;—

"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এজগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধু ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !

এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন!"—

"কাঙ্গালিনী" সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা-উপহার সজল নয়নেই দিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না! তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন-আশঙ্কায়,—

"আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি!"

অশোকবনের দৃশ্যারম্ভে আমরা সীতাকে "একাকিনী" দেখিয়াছিলাম;—এখন আবার যে একাকিনী, সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, "হিতৈষিণী"র কাছে দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখভার-লাঘব, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছে;—আর সমবেদনা ও সান্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যত-টুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর, এই সীতাচিত্রে মধুসূদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষো-দুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা অত্যাচার-কারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমা-গুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনূমান্ ঐ সকল চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন যে, উহারা রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘনাদবধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু

রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষাও উচ্চাদর্শ, এবং মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণকালে যখন মূর্চ্ছাগতা সীতা স্বপ্নে ভবিতব্য ঘটনার পট দেখিতেছেন, তখন লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্নেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে বলিয়াছিলেন ;—

"রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!"—

ইহাতে সীতাহৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; আর চিত্রও তাহাতে উজ্জ্বল হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর-একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

লক্ষ্মণকর্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন ;—রাবণ রামের কাছে সাতদিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া আজ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন ;—প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় আজ নিরন্তর হাহাকার রব! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে আসে! সীতার দুঃখে দুঃখিনী সরমা ইন্দ্রজিৎবধের সুসংবাদ লইয়া, অশোকবনে উপস্থিত ;—

"যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলাসতী, আইলা সরমা—
রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে।"

সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধবার্ত্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ করিতেছেন ;—কিন্তু কান তাঁহার, লঙ্কার হাহাকারের দিকে ;—

"কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!"—

তারপর যখন শুনিলেন,—

"প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি!"—

তখন "ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া" সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও কাঁদিয়া কহিলেন;—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীম-ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!"—

সরমা সান্ত্বনা দিলেন;—

"দোষ তব কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস দেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।"

রক্ষোদুঃখে সরমা কাঁদিতে লাগিলেন ; আর সেই সঙ্গে—

"রক্ষঃকুল-শোকে সে অশোকবনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে !"

এই ক্রন্দনেই মধুসূদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল ! ক্রন্দনে ইহার আরম্ভ হইয়াছে,—মধ্যেও নিরন্তর ক্রন্দন !—সীতার শোকের ক্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অশ্রু-প্রবাহ, এই সীতা-সরমার সম্মিলন !

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে অশোকবনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু কাব্যকলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন ! ইহা সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল ছায়ায় শোকের কি সুকরুণ চিত্র ! করুণরসের সহিত পূর্ব্বস্মৃতির মাধুর্য্যরস মিশাইয়া, কি অপূর্ব্ব রসেরই সৃষ্টি করা হইয়াছে ! ইহাতে উৎকট উৎপীড়নের নিদারুণ দৃশ্য নাই ; অথচ ইহার মাধুর্য্যরসেও যেন পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়।

বাল্মীকির সীতাকে যেন crystallise করিয়া, মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন ; এবং তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া, তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কাব্যকলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা,—যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র,—সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সান্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, সীতার পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাও মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্ব। মধুসূদন যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমার চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত !

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

গতি ও স্থিতি

ইউরোপে এখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। ইউরোপের প্রায় সকল সভ্য এবং উন্নত জাতি রণমদে মত্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ, ফরাসী রুষ এবং ইতালীয় জাতি এক দিকে, জর্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়াণ এবং তুর্কী জাতি অন্যদিকে থাকিয়া সভ্যতার আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষার পরিণতির ক্রম লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ইহা রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ; একপক্ষে গণতন্ত্রতা, খৃষ্টান সভ্যতার আদর্শ, অন্য পক্ষে শক্তিতন্ত্রতা এবং প্রভুবাদের আদর্শ। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে আদর্শের জয়-পরাজয় ঘটিবে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা যেন স্বীয় শীলতার আবরণ উন্মোচন করিয়া ভিতরের ভাবটা আমাদের খুলিয়া দেখাইতেছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা করার ইহাই শুভ অবসর; এইবার ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার এবং ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার আদর্শ বিচার করিবার সময় হইয়াছে। তাই উভয় পক্ষের চিন্তার ক্রম ও গতি আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিব। কারণ আমার এই বোধ অনুসারেই আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির বিশ্লেষণ আমি করিয়া থাকি।

আমার মনে হয় ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্য হইল গতি বা Progress; আর আমাদের এই ভারতবর্ষের শেষযুগের সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্য বিষয় হইল স্থিতি বা Conservation। কেবল ভারতবর্ষ কেন, এশিয়ার প্রায় সকল দেশের সকল পুরাতন জাতির সভ্যতার সাধ্য স্থিতি। কিসে জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, জাতির পিতৃপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব, এশিয়ার প্রায় সকল জাতিরই ইহাই চেষ্টা, ইহাই জীবনের সাধনা। এশিয়ায় দুইটি সভ্যতা প্রবল; এক ইসলাম সভ্যতা, দ্বিতীয় বৌদ্ধ বা হিন্দু সভ্যতা। দেশভেদে, প্রতিবেশ প্রভাবের

অনুসারে ইস্‌লাম সভ্যতায় কিছু কিছু পার্থক্য বা বৈষম্য থাকিলেও এখন সকল দেশের ইস্‌লাম সভ্যতার উদ্দেশ্য ও সাধ্য যে স্থিতি, সে পক্ষে কোন সংশয় নাই। বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ভারতবর্ষে এক আকারে প্রকট, চীন জাপানে অন্য আকারে প্রকট; কিন্তু স্থিতি উভয় আকারের সভ্যতারই সাধ্য বিষয়। জাপান অধুনা ইউরোপের অনুচিকীর্ষু হইলেও, ইউরোপীয় ভঙ্গীতে জাতির মতি-গতি পরিবর্ত্তিত করিলেও, জাপজাতির মজ্জাগত স্থিতির সংস্কার উহাকে আত্মরক্ষার দিকে, আত্মসংবরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাই-বেই। এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হইবার পূর্ব্বেই জাপান তাহার স্থিতি-সংকল্পের পরিচয় দিতে বাধ্য হইবেই। ভারতবর্ষের স্থিতির বুদ্ধি, অনেকটা উৎকট রোগীর রোগকে জাপ্য করিয়া রাখিবার প্রকরণের মতন; ঘরপোড়ার কাঠ যে কয়টা বাঁচাইতে পারা যায়, সেই কয়টা বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র। ভারতবর্ষের অঙ্গে, যেন স্তরে স্তরে, যবন, গ্রীক, হূণ, শবর, পাঠান, মোগল প্রভৃতির দংশন-ক্ষত লুকান আছে। ভারত-বর্ষ যেন সে সকল ঢাকিয়া রাখিয়া, সে সব স্থানে মাছিমশা বসিতে না দিয়া আরোগ্যের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। যদি বাঁচি তবে ত সুখ-ঐশ্বর্য্য—বিলাসব্যসন! জাতিগত বিশিষ্টতা-সমেত জীবন-মরণের নির্ণয় যখন এখনও ভারতবর্ষের ভাগ্যে হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে সুখ-বিলাসের সময় এখনও আসে নাই। জীর্ণ রোগী নির্দ্দিষ্ট কঠোর পথ্য অবলম্বন করিয়া যদি বাঁচিতে পারে ত বাঁচুক; পরে সমাজ-শরীরে বলসঞ্চয় হইলে তখন কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহা স্থির করা যাইবে। ইহাই হইল ভারতীয় স্থিতির মূলমন্ত্র।

ইউরোপ নূতন ভাবে, নবশক্তিতে সঞ্জীবিত; ইউরোপের ভাগ্যে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা ইউরোপের খৃষ্টানজাতিসকলের পক্ষে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এবং নূতন। তাই ইউরোপ স্বীয় অভ্যুদয়কে উন্নতি মনে করিতেছে, জাতির বিস্তৃতি এবং সংহতি-বৃদ্ধিকে গতি বা Progress ঠাওরাইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে এ খেলা

নূতন নহে। এ খেলা আমরা খেলিয়া শেষ করিয়াছি। ছিল একদিন, যখন অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমগ্র এশিয়ায় এবং এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সদ্ধর্ম্মের প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ছিল একদিন, যখন ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ছিল একদিন, যখন ভারতবর্ষের বিহারে, আশ্রমে, সংঘারামে—মন্দিরে বিদ্যার হোমাগ্নি নিত্য প্রজ্বলিত থাকিত; ভারতের নাগার্জ্জুন, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, হারীত জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কারক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা ও খেলা খেলিয়াছি; উহার পর্য্যবসানের তিক্ত ও তীব্র আস্বাদনে ব্যথাও পাইয়াছি। সুতরাং এমন ক্ষণিক—দুইশত, তিনশত বর্ষব্যাপী অভ্যুদয়কে, পদার্থতত্ত্বে সিদ্ধিলাভজনিত সামর্থ্যের বিদ্যুদ্বিকাশকে আমরা উন্নতিও বলি না, অবনতিও বলি না। ইউরোপ কিন্তু এখনও সে কথা বলে; এখনও উহার সভ্যতাকে উন্নতির এবং গতির সভ্যতা বলিয়া শ্লাঘা করে। পঞ্চাশ বৎসর পরে এমন শ্লাঘা করিবে কিনা জানি না। বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম সভ্যতার পর্য্যবসান দেখিয়া, উহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্ত্তনের ভঙ্গী বুঝিয়া মনে ত হয় না খৃষ্টান ইউরোপ আর পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বীয় সভ্যতার জন্য এমন বাহ্বাস্ফোট করিতে পারিবে। যে যখন বড় হয়, জগতের অন্য সকল জাতির মাথার উপর পা দিয়া চলিতে থাকে, সে তখনই নিজের সভ্যতার, নিজের বৈশিষ্ট্যের শ্লাঘা করিয়া থাকে। গ্রীক, রোমক, বৌদ্ধ, মুসলমান, সবাই দর্পদম্ভ করিয়া শেষ করিয়াছেন; এখন খৃষ্টান ইউরোপের পালা পড়িয়াছে; তাই খৃষ্টান সভ্যতা উন্নতির সভ্যতা, গতির সভ্যতা বলিয়া জগন্ময় বিঘোষিত হইতেছে। উন্নতি-গতি কেবলই নবীনতার পরিচায়ক; স্থিতি প্রৌঢ়তার পরিচায়ক। যখন মরণভয় থাকে না, নবজীবনের নবোদ্ধতায় প্রমত্ত থাকা যায়, তখনই উন্নতি এবং গতি ভাল লাগে, নিত্য নূতন বিলাসের আস্বাদন বড়ই মধুর বোধ হয়। পরন্তু একবার মরণের সাক্ষাৎকার হইলে,

একবার মরিতে-মরিতে বাঁচিয়া উঠিলে, একবার রোগের ও দৌর্ব্বল্যের দুঃখভোগ করিলে আর গতি-উন্নতি ভাল লাগে না। তখন কেবল বাঁচিবার সাধ হয়; আমার যাহা, আমি যাহাদের, সে সব, আমার মতন করিয়া—আমার সাধের মতন করিয়া, বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা হয়। তখনই স্থিতির মাহাত্ম্য, conservationএর মহিমা বুঝিতে পারি। ইউরোপের সেই দিন যেন সন্নিকট হইয়াছে। এই ভীষণ যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, ইহার পরিণাম যে কেমন ও কোন রকমে হইবে, তাহা কেহ জানে না; তবুও এখন হইতেই সুর উঠিয়াছে রক্ষা কর—রক্ষা কর; ইউরোপের গণতন্ত্রতা, ইউরোপের খৃষ্টান সভ্যতা, ইউরোপের দয়া-মায়া-করুণা, ইউরোপের বিশিষ্টতা রক্ষা কর—রক্ষা কর। ইংলণ্ড স্বীয় মনস্বী-প্রধান মন্ত্রীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের রক্ষানীতি,—শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিব। স্থিতির ইহাই প্রথম সুর; পরে যত আঘাত পাইবে, যত আত্মরক্ষায় বিব্রত হইবে ততই এই সুর জমাট বাঁধিবে; শেষে জর্ম্মণী ছাড়া ইউরোপের সর্ব্বত্র স্থিতিশীলতার ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে।

ফরাসী মনীষী মসিয়ে রেণান্ বলেন, যে জাতির ধর্ম্মে পরকালের চিন্তা অধিক, যে জাতি মরণের পরপারের ভাবনা লইয়া অত্যন্ত বিব্রত, সে জাতি স্থিতিশীল না হইয়া পারে না। খৃষ্টান ধর্ম্মে পারলৌকিক চিন্তা যথেষ্ট আছে; খাঁটি খৃষ্টান ইহকাল অপেক্ষা পরকালের ভাবনা অধিক চিন্তা করে। কিন্তু ইতালীর মনীষী গালিমানী ফেরেরো বলেন যে, যে দিন হইতে ইউরোপ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে, ভারতবর্ষে ও চীনে যাইবার জলপথ বাহির করিয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রমত্ত হইয়াছে, অর্থাকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা হইয়াছে, সেই দিন হইতে খৃষ্টান ইউরোপ অল্পে অল্পে পরকালের ভাবনা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের যত অভ্যুদয় হইয়াছে, যত বিস্তৃতি, যত পুষ্টি হইয়াছে ততই ইউরোপ পরকাল ভুলিয়াছে। শেষে

পদার্থবিদ্যার বিষম আলোচনায়, মায়াজের অতি চর্চ্চায় অপরাজেয় শক্তিধর হইয়া ইউরোপ আত্মাকে—ভগবান্‌কে একেবারেই ভুলিয়াছে। ফেরেরো বলেন যে, গত তিন শত বৎসরকাল ইউরোপ পরকাল এবং পরমাত্মাকে ভুলিয়া, দেহের তুষ্টি পুষ্টির জন্য ব্রিত্রত হইয়া কেবল উন্নতির চিন্তাই করিয়াছে,—ইউরোপের অতীতের সহিত বর্ত্তমান কালের তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে ইদানীং ইউরোপ কেবল গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই গতি বা Progress এর অগ্নি-পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। আগামী শতবর্ষকাল এ পরীক্ষা চলিবে। সে পরীক্ষায় ইউরোপ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ইউরোপের গতির বা উন্নতির জয় হইবে; এশিয়ার স্থিতিকে চিরপরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে, তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ; তাহা অতীত কালে কখনই হয় নাই, অতএব ভবিষ্যতেও হইবার নহে। ইহাই ফেরেরোর সিদ্ধান্ত।

সমাজতত্ত্বের ইহা মূল সূত্র যে, ব্যষ্টির যেমন পরিণাম হইবে, যে ক্রম অনুসারে সকল ব্যষ্টির পর্য্যবসান হইবে, সমষ্টিরও সেই পরিণতি এবং সেই ক্রম অনুসারে পর্যাবসান সাধিত হইবে। বহু দেহের সমষ্টিতে সমাজ-শরীর নির্ম্মিত; সুতরাং সমাজ-শরীর একটা organism, দেহীর গুণোপেত। সুস্থ, সংযত, সাধু দেহের পরিমাণ শতবর্ষ; সুস্থ, সংযত সাধু সমাজ-শরীরের পরিমাণ সহস্র বৎসর। দেহীর যেমন পাপ করিলে অকাল-মৃত্যু ঘটে; সমাজ-শরীরেরও তেমনি পাপ করিলে অকাল-মৃত্যু ঘটে। দেহীর যেমন জীবনের দশ দশা আছে, সমাজ-শরীরের তেমনি দশ দশা আছে, সুদিন-কুদিন, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য, রোগ-শোক আছে। তবে সাধু পিতার যেমন সৎপুত্র থাকিলে পিতার বংশের ধারা এবং বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত হয়; সে ধারা অব্যাহত ভাবে দীর্ঘকাল কালপ্রবাহের সঙ্গে চলিতে পারে; তেমনি সাধু-সংযমী সমাজে সাধু পুত্রের বা ব্যষ্টির উদ্ভব হইলে সুদিন-কুদিন নির্ব্বিশেষে সমাজ চিরকাল স্বীয় বিশিষ্টতা

রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তিব্বতের লামাগণ বলেন, কেবল কি তাই! সমাজ-শরীর জীর্ণ হইলে, যেমন জীর্ণ মন্দির পুরাতন বুনিয়াদের উপর গড়িয়া লইতে হয়, তেমনই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হয়। যেমন লামা মরে না, যুগে যুগে নূতন দেহ ধারণ করে; তেমনি সদ্ধর্ম্মের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মরে না, মাঝে মাঝে তাহাকে নূতন দেহ দিয়া নবীন ভাবে গড়িয়া লইতে হয়। পুরাতন মন্দিরে যেমন পূজা আরতি হইত, নূতন মন্দিরেও ঠিক সেই পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পূজা আরতি চলিবে, ক্রমের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না; কেবল মন্দিরটা নূতন করিয়া, নবীন দৃঢ়তা সংযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। যুগে যুগে এক একজন ধর্ম্মপ্রচারক, এক একজন সিদ্ধ অর্হৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সমাজকে নূতন আকার দিয়া যান। কিন্তু এ নবীনতা স্থিতির হেতু, অমরতার সাধক; পরিবর্ত্তন বা উন্নতির, গতির বা চাঞ্চল্যের বিধায়ক নহে। পিতার যোগ্য পুত্র পিতৃপদই অনুসরণ করিবে, নূতন মানুষ হইলেও পিতৃ-পিতামহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

এই সঙ্গে তন্ত্র একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। তন্ত্র বলেন কর্ম্মী সাধকের পক্ষে প্রতিবেশ প্রভাব (environment) অতি তুচ্ছ ব্যাপার। জলবায়ুর দোহাই দিয়া তুমি যে বিগড়াইবে, তাহা তন্ত্র শুনেন না। তন্ত্র বলেন, আত্মবান্ মানুষ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিলে, জলবায়ুর প্রভাবকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারে। ইংরেজ যে ভাবে শীতপ্রধান দেশের আচারব্যবহার, রীতিপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শীতপ্রধানদেশের উপযোগী স্বীয় বিশিষ্টতাকে অব্যাহত রাখিয়া এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি নরনারীকে সেইভাবে শাসনে রাখিয়াছেন; তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে তন্ত্রের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। যস্মিন দেশে যদাচারঃ বলিয়া ইংরেজ ত ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসী সাজেন নাই! এখানকার ঘোর গ্রীষ্মে অধীর হইয়া ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার,

আহার-আচ্ছাদন গ্রহণ করেন নাই। তেমন করিলে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত, বিশিষ্টতা থাকিত না।

এইবার জর্ম্মণীর গতি বা Progressএর প্রকরণটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, জর্ম্মণজাতি অধুনা ইহার যতটা আলোচনা করিয়াছে, এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া ও সাধনার বিষয়ীভূত করিয়া দেখাইয়াছে, ততটা ইউরোপের অন্য কোন জাতিই করে নাই। এই গতি বা শক্তিবাদ জর্ম্মণ পণ্ডিত নিজ্‌শ্‌ (Friedrich Nietzsche) যেমন সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার উক্তি অবলম্বনে আমাদিগকে গতি-তত্ত্ব বা শক্তিবাদ বুঝিতে হইবে। নিজ্‌শ্‌ বলিতেছেন,—

What is good? All that increases the feeling of power,—the will to power—power itself—in man.

সৎ পদার্থ কি? যাহা শক্তিসাধক, যাহা শক্তি, শক্তির অনুভূতি, শক্তি প্রয়োগের অভিলাষ তাহাই সৎ, সাধু ও সুন্দর। যাহার দ্বারা শক্তির বৃদ্ধি হয়, শক্তিপ্রয়োগের বাঞ্ছা প্রকট হয়, মনুষ্যের মধ্যে তাহাই সৎ, তাহাই ভাল।

What is bad? All that comes from weakness. অসৎ কি? মন্দ কি? যাহা দৌর্ব্বল্যজাত, যাহা শক্তিহীনতার পরিচায়ক, যাহা শক্তিহীনতা হইতে সঞ্জাত তাহাই মন্দ, তাহাই অসৎ।

What is happiness? The feeling that power increases—that resistance is being overcome!

আনন্দ কিসে? সুখ কি? আমাতে শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে এই অনুভূতিই আনন্দ। আমি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিতেছি সেই চিন্তাই সুখদায়ক।

Let us have, not contentedness, but more power—not peace at any price, but warfare—not virtue, but efficiency.

The weak must perish! That is the first principle of our charity. And we must help them to do so.

আমরা কেবল তুষ্টিতৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিব না, পরন্তু অধিক ক্ষমতা, অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সাধনা করিব; যে কোন উপায়ে শান্তিলাভ করিতে চাহিব না, পরন্তু যুদ্ধের জন্য, কেবল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধনা করিব; আমরা সাধুতা লাভ করিলে তৃপ্ত হইব না, পরন্তু যোগ্যতার জন্য প্রয়াস করিব। দুর্ব্বল শক্তিহীনকে মরিতেই হইবে। ইহাই আমাদের দয়াধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। যাহাতে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন মরিতে পারে, সে পক্ষে আমাদের সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

নিজ্‌শ্‌ এমন উপদেশ দিলেন কেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

Life is essentially the appropriation, the injury, the vanquishing of the unadapted and weak. Its object is to obtrude its own forms and insure its unobstructed functioning. Even an organisation whose individuals forbear in their dealings with one another (a healthy aristocracy for instance) must, if it would live and not die, act hostilely toward all other organisations. It must endeavour to gain ground, to obtain advantages, to acquire ascendancy. And this is not because it is immoral, but because it lives and all life is will to power.

জীবন মানে কি? বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে? যাহা আমার পক্ষে অনুপযোগী, যাহা আমা অপেক্ষা দুর্ব্বল বা শক্তিহীন, সেই সকলকে নষ্ট করিয়া বা আত্মসাৎ করিয়া বিরাজ করার নামই জীবন। যে দুর্ব্বলকে, অনুপযোগীকে নষ্ট বা আত্মসাৎ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই বাঁচিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে; জীবনের আর

একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, জীবন নিজের বৈশিষ্ট্য-যুক্ত আকার, ভাব ও প্রকৃতিকে ফুটাইয়া, তাহার অব্যাহত ভাবে ক্রিয়ার সুব্যবস্থা করিতে প্রয়াস পায়। মনে কর যদি কোন সুস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায় (যেমন অভিজাতবর্গ) এমন ভাব ধারণ করে যে তাহার ব্যষ্টি আপোষের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি করিতে উদ্যত না হয়, তাহা হইলে, সেই সমবায় যদি সজীব থাকিতে চাহে, তাহা হইলে, অন্য সকল গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবেই। এমন যদি না করে ত তেমন সমবায় অচিরে শিথিল হইবে—মরিয়া যাইবে। কারণ সজীব থাকিতে হইলে সদাসর্ব্বদা অধিক লাভ, অধিক বিস্তৃতি, অধিক প্রাধান্য-বৃদ্ধি উপার্জ্জন করিতে হইবেই। যেহেতু স্থবিরতা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। এমন সকল কাজ করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা নহে; উহাই জীবনের ধর্ম্ম; কেন না জীবন বা সজীবতা শক্তি প্রয়োগের—শক্তি অর্জ্জনের এবং সঞ্চয়ের নামান্তর মাত্র।

এই সিদ্ধান্তটা নিজ্‌শ্‌ জীবতত্ত্বের (biology) দিক দিয়া আর একটু ফুটাইয়া বলিয়াছেন,—

In itself an act of injury, violation, exploitation or annihilation cannot be wrong, for life operates essentially and fundamentally by injuring, violating, exploiting and annihilating and cannot even be conceived of as existing otherwise. One must admit indeed, that from the highest biological standpoint, conditions under which the so-called rights of others are recognized must be ever regarded as exceptional conditions—that is to say, as partial restrictions of the instinctive power-seeking will to live of the individual, made to satisfy the more powerful will to live of the mass. Thus small units of power are sacrificed to create large